পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত

নূতন সংস্করণ—অগাস্ট, ১৯৭৫

অনুবাদ সিরিজ—



রবিনসন ক্রুসো

[ড্যানিয়েল ডিফো]

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অনূদিত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

অগাস্ট
১৯৫৭

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯


উপহার

—লেখক-পরিচিতি—

লণ্ডনের সেণ্ট-জাইলস্ পাড়ায় এক কসাই ছিলেন, জেমস্ ফো। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে এক ছেলে হল তাঁর, ড্যানিয়েল ডিফো।

নিজে কসাই হলে কী হবে, জেমস ফো মশাইয়ের গোড়া থেকেই সংকল্প ছিল যে ছেলেকে তিনি ধর্মযাজক করবেন। সেই অনুযায়ী শিক্ষা দেবার জন্য ড্যানিয়েলকে তিনি চৌদ্দ বৎসর বয়সেই নিউইংটন গ্রীন বিদ্যালয়ে ভরতি ক'রে দিলেন।

শিক্ষা সমাপ্ত করে যাজকতার দিকে কিন্তু গেলেন না ড্যানিয়েল, শুরু করলেন মোজার ব্যবসা। ব্যবসা ভালভাবেই চলতে পারত, যদি একই সঙ্গে রাজনীতির চর্চাও তিনি শুরু না করতেন।

রাজনীতি চর্চার অঙ্গ হিসাবেই রাজনৈতিক সাহিত্য রচনায় হাত দিতে হয়েছিল ড্যানিয়েলকে। ১৬৯১ থেকে ঐ জাতীয় নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রচারপুস্তিকা ধারাবাহিকভাবে তাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হতে থাকে।

মোজার ব্যবসা ইতিমধ্যে কবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, দেদার লোকসান ড্যানিয়েলের ঘাড়ে চাপিয়ে। দেনায় দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত যখন বিক্রি হয়ে গিয়েছে, তখন, ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে উনি লিখে ফেললেন "রবিনসন ক্রুসো", যার পুরোনাম অতি প্রকাণ্ড—"দ্য লাইফ অ্যাণ্ড স্ট্রেঞ্জ সারপ্রাইজিং অ্যাডভেঞ্চার্স অব রবিনসন ক্রুসো"।

অসামান্য সাফল্য লাভ করল এই বই। চার মাসে চার সংস্করণ শেষ। তারপর একের পর এক অনেক বই-ই লিখলেন ড্যানিয়েল—'ডানকান ক্যাম্বেল', 'কাপ্তেন সিঙ্গলটন', 'রোক্সানা', 'ফার্দার অ্যাডভেঞ্চার্স অব রবিনসন ক্রুসো' ইত্যাদি।

১৭৩১-এর ২৬শে এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

এক

খাঁটী ইংরেজ আমরা নই। জার্মানি থেকে এসে আমার ঠাকুরদা ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন হাল বন্দরের অনতিদূরে। নাম ছিল তাঁর ক্রুয়েসার, সেটাই সংক্ষিপ্ত হয়ে 'ক্রুসো'তে দাঁড়াল আমার বাবার আমলে।

ওদিকে আমার ঠাকুরমা, এদিকে আমার মা, এঁরা দু'জনেই ছিলেন ইংরেজ মহিলা। কাজেই আমার দেহে যে বারো বা চৌদ্দ আনাই ইংরেজরক্ত, তাতে সন্দেহ নেই কিছুই। মামারা হলেন রবিনসন, সেই সূত্রে রবিনসন-নাম আমাকেও দেওয়া হয়েছিল নাম-করণের সময়। ওটাকেই খাটো করে নিয়ে অন্তরঙ্গ মহল সবাই আমায় ডাকে রবিন বলে।

এক রবিন ছিলেন রবিন হুড, তাঁর স্মৃতিকে ইংলণ্ডের লোক এখনো পূজা করে। দুর্ধর্ষ সংগ্রামী ছিলেন তিনি, আর তাঁর সংগ্রাম ছিল দুঃস্থ আর্ত নিপীড়িত জনগণের অনুকূলে, অত্যাচারী ধনিক শ্রেণীর বিপক্ষে। জীবনপ্রভাতে ঐ রবিন নাম আমাকেও সংগ্রামী হওয়ার প্রেরণা কিছু যুগিয়েছিল কিনা, তা আজ আর নিশ্চয় করে বলতে পারি না। তবে সন্দেহ এতে তিলমাত্র নেই যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে সংগ্রামী মনোবৃত্তি একটা দুর্জয় দুর্দম হয়ে উঠতে লাগল দিনে দিনে, অজানা দেশে গিয়ে নিত্য নতুন বিপদের সঙ্গে পাঞ্জা কষে কষে পৌরুষের পরিচয় দেবার জন্য অধীর হয়ে উঠলাম আমি।

তিন ভাই আমরা। বড় ভাই যুদ্ধে গিয়ে বীরগতি লাভ করে-

ছিলেন। ছোটভাইটি অতি অল্প বয়সেই হারিয়ে গিয়েছিল। কাজে কাজেই আমি হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মাতাপিতার নয়নের মণি, একমাত্র আশা ভরসার স্থল। দেশ-বিদেশ পর্যটনের দিকে আমার ঝোঁক দেখলে তাঁরা যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন, নানা উপদেশের বাণী অবিরাম শোনাতে থাকবেন ঐ সর্বনাশা ঝোঁক আমার মগজ থেকে দূর করে দেবার জন্য, তাতে সন্দেহমাত্র ছিল না আমার।

পিতামহের ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। তাতে যথেষ্ট অর্থাগম তাঁর হয়েছিল। বাবা কিন্তু ব্যবসার দিকে গেলেন না সংসারের কর্তৃত্ব-লাভের পরে। কারণ ওতে ঝক্কি ঝামেলা অনেক, কখন কোন্ দিক দিয়ে লোকসান ঘটে যায়, আগে থেকে সতর্ক হওয়া যায় না সর্বদা। অনিশ্চয়তা মাথায় নিয়ে জীবন কাটাবার মত ধাতুর লোক বাবা ছিলেন না, তাই ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে জমি-জায়গা কিনে ফেললেন তিনি, পল্লী-অঞ্চলে মনোরম একখানি বাড়ি তৈরি করে চাষবাসের নির্ঝঞ্ঝাট কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন একেবারে।

জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমি এমনিধারা আভাস পাচ্ছি যে আর একটু বড় হলেই আমাকেও বাবা ঐ কাজে টেনে নেবেন। তাঁর অবর্তমানে তালুকদারিটা আমাতেই অর্শাবে ত! হাতেকলমে সব কাজ শিখে ওয়াকিবহাল না হলে চলবে কেন?

আমি কিন্তু পনেরো-ষোল বছর বয়স হতেই সংকল্প করে বসে আছি যে ঐ কর্মটি আমি কিছুতেই করব না। দিনের পর দিন, বছরের পরে বছর জন-মুনিষ খাটানো, আর গম-বোঝাই গাড়ি হাল বন্দরের আড়তদারদের কাছে পাঠানো তাদের হাত-তোলা দু'পয়সার প্রত্যাশায়? যীশু কহো, ও-সব আমার দ্বারা হবে না।

সংকল্পটা মনে মনেই ছিল অনেকদিন, কিন্তু চিরকাল কি আর থাকে তা? একদিন তা প্রকাশ হয়ে পড়ল, হঠাৎ কী যেন খেয়ালের বশে আমি বলে বসলাম—"চাষবাস আমার ভাল লাগবে না বাবা, আমি অন্য কিছু করব ভাবছি—"

বাবার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কিছুক্ষণ কথাই বেরুলো না তাঁর মুখ থেকে, হাঁ করে শুধু চেয়েই রইলেন আমার মুখের দিকে।

কথা যখন বেরিয়েই পড়েছে মুখ থেকে, এক্ষুণি একটা ফয়সালা হয়ে যাক। আমি মরিয়া হয়ে বললাম আবার—"বাড়িতে বসে থাকা আমার ইচ্ছে নয়। আমি ভেবেছি, তোমার মত হলে নাবিকের কাজ নিয়ে দেশে দেশে ঘুরব আমি—"

"না-বিকের কাজ?" বাবার যখন বাক্যস্ফূর্তির ক্ষমতা ফিরে এল, তিনি ক্রুদ্ধভাবে বললেন—"নাবিকদের কাজ করতে গিয়ে কত লোক মারা যায় জাহাজডুবিতে, জান?"

"আবার কত লোক ত মরেও না! খালাসী হয়ে কাজে ঢুকে কত লোক কাপ্তেন পর্যন্ত হয়েছে। তার উপরে ধর গিয়ে, কত দেশ দেখতে পাব, কত রকমের মানুষ, নদী পর্বত অরণ্য নগর—"

সেদিন আলোচনা আব চলল না। বাবা অসম্ভব-রকম রেগে উঠলেন, কত যে কটু তিরস্কার করলেন, তার আব লেখাজোখা নেই। একটাই কথা তাঁর বলবার ছিল, সেইটাই বারবার আওড়ালেন নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। সেটা হল এই যে সমুদ্রে যারা যায় নাবিকবৃত্তি নিয়ে, তারা সবাই চালচুলোহীন বাউণ্ডুলে লোক; বাড়িতে যার তালুকদারি আছে, আরামে বিরামে জীবন কাটাবার মত সম্বল আছে, সে যদি তা ফেলে রেখে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে থাকে, তবে বুঝতে হবে সে একটা বদ্ধ পাগল, তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা উচিত।

এরপর চলল প্রাণান্তপণ টানা হ্যাঁচড়া, প্রায় দুই বছর ধরে। আমিও সংকল্প ত্যাগ করব না, বাবাও জেদ ছাড়বেন না। নাবিকের কাজ নিয়ে জাহাজে জাহাজে সারা দুনিয়া টহল দেব, এর চেয়ে সুখের জীবন যে মানুষের ভাগ্যে জুটতে পারে, বাবার কোন যুক্তিতেই তেমন ধারণা করবার হেতু আমি দেখতে পেলাম না।

বাবার যুক্তি যে অ[illegible]

শতকরা নিরানব্বইটা [illegible]

নিজের বাড়িতে বসে থাক[illegible]

যাও ঘোড়ায় চড়ে, ডজন[illegible]

তোমার জমিজিরেত, দে[illegible]

ভাবে বকুনি ঝাড়—ফসল[illegible]

পড়তে লাগল তোমার [illegible]

পারে? বে-থা করে স[illegible]

পার্লামেন্টের সদস্য হও, [illegible]

খুলুক আর "ইওর অন[illegible]

ভদ্রলোকের কাছে এই [illegible]

ঠিক কথা। ঐ [illegible]

ভদ্রলোকের চোখে এ[illegible]

নিরানব্বইটা! অর্থাৎ [illegible]

সেই একজনের নামই [illegible]

রবিন ক্রুসো অর্থা[illegible]

না, ধূসর গোধূলি যা[illegible]

করবার জন্য, ঢেউয়ে [illegible]

ঝাঁপিয়ে পড়ার আম[illegible]

কিছু উপেক্ষা করে তাকে [illegible]

নিজের হাতে গড়বার জ[illegible]

মরিয়া হইতে অমর!"

হাল বন্দর বেশী দূরে [illegible]

বেড়াতে যাই। আড়ত [illegible]

যাচ্ছে সেখানে, উঠে বসা[illegible]

গেছি একদিন হালে

আড়তের দরজায় গাড়ি[illegible]



আমি জানালাম বন্দুক পেলে শিকার করতে পারি। [পৃঃ ২৭

সমুদ্রের দিকে। বন্দরটা আমাদের এমন-কিছু সুদৃশ্য বা জমকালো নয়। জল ঘোলা, আকাশ ধোঁয়াটে, নানাদেশী খালাসীদের চিল্লানিতে কানে তালা লাগবার যোগাড়। তবু—আমি রবিনসন ক্রুসো, আমার চোখে ঐ নোংরা বন্দরই যেন স্বর্গদ্বার। ওখানে গেলেই আমি যেন মনশ্চক্ষু দিয়ে দেখতে পাই অজানা উপকূলের তুঙ্গ গিরি, অজানা নদীর ধারে মিনারে-গম্বুজে আকাশছোঁয়া প্রাসাদ-পুরী, অজানা অরণ্যে নরখাদকদের দঙ্গল আর মহাকায় সিংহ-শার্দূলের ভয়াল মিছিল। ঐ জাহাজগুলোর যে-কোন একটাতে চড়ে বসলেই—

চড়ে বসার সুযোগ আসবেই একদিন। প্রতিবার বন্দর থেকে বাড়ি ফেরার সময় আমি উদ্বেল সমুদ্রকে অন্তরের আকুতি জানিয়ে যাই—"প্রসন্ন হও জলপতি, তোমার রাজ্যের বাসিন্দা হওয়ার অনুমতি আমায় দাও তুমি, অচিরেই দাও।"

কে জানত যে এইবারই জলপতি পূর্ণ করবেন আমার এত দিনের প্রার্থনা?

বন্দর-এলাকায় ঢুকতেই দেখা সহপাঠী বন্ধু স্টিভের সঙ্গে। নিউইংটন গ্রীনে কয়েক বৎসর একসাথে পড়াশোনা করেছি। মনে পড়ে গেল, তখনই শুনেছিলাম যে ওর বাবা একখানা ছোট জাহাজের কাপ্তেন।

স্টিভ ত আমায় দেখে আহ্লাদে আটখানা। "চল্ চল্, আমাদের জাহাজ দেখিয়ে আনি তোকে।"

ছোট্ট জাহাজখানি, সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্যে তৈরী হয় নি। উপকূল-বাণিজ্যের জন্য বেসরকারী মালিকানায় যে সুবৃহৎ নৌবহর আছে আমাদের, তারই একখানি কনিষ্ঠ নৌযান স্টিভদের এই "সী-নিম্ফ"। স্টিভের বাবা আগে কাপ্তেন ছিলেন এর, সম্প্রতিই কিনে নিয়েছেন ভূতপূর্ব মালিকের কাছ থেকে।

বলা বাহুল্য, বন্ধুর প্রস্তাব লুফে নিলাম আমি, উঠলাম গিয়ে

জাহাজে। স্টিভ খুবই উৎসাহের সঙ্গে আমায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব-কিছু দেখাতে লাগল। তখনই শুনলাম, জাহাজের কোন কাজ সে করে না, বাপ মালিক হয়েছেন—এই সুযোগে সে এসে চড়ে বসেছে খানিকটা জলযাত্রার আনন্দ উপভোগের জন্য। হাল থেকে লণ্ডন। লণ্ডন থেকেই ফিরবে সী-নিম্ফ, ফিরবে স্টিভও।

"কী জোর বরাত ভাই তোর!" আমি স্টিভকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে নিজের মনের দুঃখ আর চেপে রাখতে পারলাম না। "আমার যে কী আগ্রহ জাহাজে চাকরি নেবার! তা বাবার কিছুতেই মত হচ্ছে না। তবু যাব, যাবই আমি। একবার সুযোগ পেলেই হয়।"

স্টিভ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—"এইত সুযোগ! যেতে চা'স যদি এই ত আমাদেরই জাহাজ রয়েছে, এখান থেকেই হাতে-খড়ি নিয়ে নে না! চাকরির কথা এখন থাকুক, একবার লণ্ডন পর্যন্ত ঘুরে আয়! দেখ—কেমন লাগে! যদি ঘুরে আসবার পরেও তোর মত না বদলায়, বাবাকে বলে আমি এই জাহাজেই তোর চাকরি করে দিতে পারব। তারপর কাজকর্ম শিখে নেবার পরে দেখবি, বড় বড় জাহাজ থেকে ডাকাডাকি করছে তোকে—"

আমি বুঝলাম যে একা একা নৌযাত্রায় বেরিয়ে সমবয়সী সঙ্গীর অভাবে বন্ধু আমার ভ্রমণের আনন্দটা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছে না। তাই আমাকে সঙ্গে নেবার চেষ্টা। বুঝলাম, কিন্তু তাতে দ'মে যাওয়ার কারণ কিছুই দেখলাম না। স্টিভ যা ভাবে ভাবুক, আমার কী তাতে? ওকে উপলক্ষ করে আমার যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়, হয়ে যাক না! সী-নিম্ফকে ত আর দাসখত লিখে দিচ্ছি না আমি!

আমি রাজী হয়ে যেতেই স্টিভ তার বাবাকে গিয়ে ধরল—তার একটি বন্ধুকেও নিয়ে যেতে হবে লণ্ডন। কাপ্তেন তাতে আপত্তির কিছু দেখতে পেলেন না, আমার সঙ্গে কোন কথাবার্তা

কইবারও দরকার দেখলেন না। স্টিভের বন্ধু ত স্টিভের বন্ধু। স্টিভ যদি সঙ্গে একটা ল্যাংবোট নিতে চায়, কাপ্তেনের তাতে কী এসে যায়?

আমি রাজী হয়ে গিয়েছি। এতদিনের আশা অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে পূর্ণ হবার উপক্রম দেখা দিতেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই রাজী হয়ে গিয়েছি স্টিভের প্রস্তাবে। যাই ত একবার লণ্ডন পর্যন্ত! তারপর, প্রয়োজন বুঝি ত বাড়ি আসব ফিরে, মা-বাবার অনুমতি চাইব শেষবার। সে-অনুমতি পাই বা না পাই, আমার ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ত ততদিনে স্থিরই হয়ে যাবে নিশ্চয়ই, ওঁদের নিষেধে তেমন গুরুত্ব আর আরোপ না করলেও চলবে।

দিন কেটে গেল অভূতপূর্ব উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে এলো। বাড়ির গাড়িতে হাল-এ এসেছিলাম, গাড়ির কোচোয়ান কি পথে পথে ছুটোছুটি করছে এখন আমার খোঁজে? খুবই সম্ভব। আমায় না নিয়ে বাড়ি ফিরলে সে ত দারুণ বকুনি খাবে মনিবের কাছে! নিশ্চয়ই খুঁজছে সে আমায়। হয়ত এই বন্দরেই সে উপস্থিত আছে এই মুহূর্তে। আমি যথাসম্ভব আড়ালে আড়ালে রইলাম, যাতে হঠাৎ কূল থেকে সে আমায় দেখতে না পায় জাহাজের উপর। দেখতে পেলেই সে হাঙ্গামা করবে একটা। তার ফলে স্টিভের বাবা হয়ত বেঁকে বসবেন, আমায় নামিয়ে দেবেন জাহাজ থেকে।

রাত্রি হল। রাত্রি কেটেও গেল নির্বিবাদে। ভোরবেলায় জাহাজ খুলে দেওয়া হল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, সী-নিস্ফ সমুদ্র দিয়েই চলছে বটে, কিন্তু উপকূল ঘেঁষে। আমি পাকা সাঁতারু, ইচ্ছে করলে জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দশ-পনেরো মিনিটের ভিতর কূলে গিয়ে উঠতে পারি আবার। অবশ্য, সে-ইচ্ছে আমার হবে কেন? যে-মুক্তি আমি চাইছিলাম এতদিন, তাই ত

এবার পেয়েছি হাতের মুঠোয়। ঘরসংসারের অষ্টবন্ধনে কি আর আমি ফিরে যাই ?

মনের আনন্দ কিন্তু দেখতে দেখতে উবে গেল সেই দিনই। কূলের পাহাড়টা এক জায়গায় ডানা মেলে দিয়েছে সমুদ্রের ভিতর অনেকদূর পর্যন্ত। সেটাকে বেড় না দিয়ে এগুবার উপায় নেই, আর বেড় দেওয়া মানেই বাহির সমুদ্রে গিয়ে পড়া। সেখানে উত্তাল ঢেউ, সী-নিম্ফ যেন জলদেবী নিম্ফদের মতই ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচতে লাগল মনের আনন্দে।

নিম্ফের যাতে আনন্দ, আমাদের গভীর নিরানন্দের কারণ সেটাই। স্টিভের আর আমার। দু'জনই সমুদ্রপীড়ায় শয্যাশায়ী। মাথা তুলবার শক্তি নেই। স্টিভ ঝানু নাবিকের ছেলে, সে শুয়ে শুয়েও সাহস দিচ্ছে আমায়—"আরে, এ আর কতক্ষণের ? পেট ভরে রুটি মাংস খা দেখি, এখনই সেরে যাবে।"

কথা শুনে অত দুঃখেও হাসি পেলো আমার। এক চুমুক জল পেটে থাকছে না, এই অবস্থায় রুটি মাংস খাব পেট ভরে ? স্টিভকে বললাম—"তুই খা দেখি !" সে আর জবাব দিল না।

যা হোক, সমুদ্রপীড়ার প্রকোপটা কমে এল পরের দিন। খেতে পারলাম, যা হোক কিছু। একসময় উঠে এলাম ডেক পর্যন্ত। কিন্তু কী গেরো ! বাইরে আসতেই চক্ষুস্থির একেবারে। নাবিকদের ভীত ত্রস্ত ভাব, কাপ্তেনের আদেশ শোনা যাচ্ছে—"পাল গোটাও ! একে একে সব পাল গোটাও !"

স্টিভ চাপা গলায় বলল—"ঝড় উঠবে। দেখছিস না, এক বিন্দু বাতাস কোথাও নেই, আর আকাশের রং কী রকম ঘোলাটে !"

ঝড় উঠবে ? আমার দারুণ লোভ হল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি —ঝড়ের সময় সমুদ্রের চেহারা কেমন দাঁড়ায়। গল্পই শুনেছি এ-যাবৎ, পাহাড়-সমান ঢেউ তুলে সমুদ্র যেন পৃথিবীকে ডুবিয়ে তলিয়ে দেবার জন্য ধেয়ে আসে ঝঞ্ঝার তাড়নায়, বড় ছোট সবরকম জলযান

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় যে-কোন বন্দরে মাথা গুঁজবার জন্য, কূলে কূলে উপকূলরক্ষীরা দড়িদড়া নিয়ে তৈরী হয় বিপন্ন ডুবন্ত মানুষগুলোর দিকে ছুড়ে ছুড়ে মারবার জন্য—

এসব চাক্ষুষ দেখবার শখ আমার খুব। কিন্তু আজ তার সুযোগ হয়েও হল না। স্টিভের বাবা দূর থেকেই দেখতে পেলেন আমাদের দুইজনকে, আর সঙ্গে সঙ্গে বাজখাঁই গলায় হুংকার ছাড়লেন, "যাও, যাও, কেবিনে যাও স্টিভ! এ-সময়ে কদাচ বাইরে থেকো না।" নাম তিনি নিজের ছেলেরই করেছেন অবশ্য, কিন্তু আদেশটা যে আমার সম্পর্কেও সমানই প্রযোজ্য, তাও কি আর বুঝতে বাকী থাকে আমার? সুবোধ বালকের মত কেবিনের গর্তে ঢুকে পড়তেই হল। একে কাপ্তেন, তায় বন্ধুর পিতা, তাঁর কথা অগ্রাহ্য করার ত কোন উপায়ই নেই!

পরে বুঝলাম, কাপ্তেন অকারণে দেন নি সেই কঠোর আদেশ। ঝড় বাড়তে লাগল ক্রমশঃ, ঢেউয়ের পরে ঢেউ সী-নিম্ফকে নিয়ে লোফালুফি করতে লাগল, যেমন হাতে হাতে বল নিয়ে লোফালুফি করেছি আমরা নিউইংটন গ্রীনের খেলার মাঠে। আমাদের মত আনাড়ী দু'টো ছেলে এ-সময়ে ডেক-এ থাকলে টাল সামলাতে না পেরে সমুদ্রে পড়ে যাওয়ার খুবই আশঙ্কা ছিল।

সারা রাত ঝড়ের তাণ্ডব অব্যাহতই রইল। কী করে যে সী-নিম্ফ বেঁচে গেল ভরাডুবি থেকে, সেই এক পরম আশ্চর্য। পরের দিন সকাল বেলায় ঝড় থামল যখন, বাইরে এসে জাহাজের দশা দেখে চক্ষুস্থির। মাস্তুল সব কেটে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে জাহাজের বোঝা কমাবার জন্য। দু'খানা নৌকো ছিল ছাদের সঙ্গে ঝোলানো, ভেসে গিয়েছে দু'খানাই। রেলিং ভেঙেছে। চালানী মাল ডেক-এ যা-কিছু রাখা হয়েছিল খোলের ভিতর স্থানাভাবের দরুন, ভেসে গিয়েছে সব।

চোখে ত এই পর্যন্তই দেখলাম। কানে যা শুনলাম, তা আরও

ভয়াবহ। নাবিকেরা গল্প করছে, তিনখানা জাহাজ তারা আশে-পাশেই ডুবে যেতে দেখেছে। সব জাহাজেরই সব লোক নৌকোয় উঠেছিল, কিন্তু সেই প্রলয় ঝড়ে একখানা নৌকোও যে টিকে গিয়েছে শেষ পর্যন্ত, এমন আশা কোন পাগলও করে না।

দমে গেলাম? শুনলে আশ্চর্য হবে সবাই, এমন ভয়ানক ভয়ানক কথা শুনেও মোটেও আমি ভয় পাই নি। কেমন যেন মনে হল আমার, জাহাজগুলো ডুবে গেলেও নৌকোগুলো কখনো ডোবে নি। তারা ভেসে ভেসে হয়ত অনেকদূরের কোন উপকূলে গিয়ে উঠেছে এতক্ষণ। অত-অত মানুষ পট্ করে মারা পড়বে, এও কি হয় নাকি?

স্টিভটা যে এত ভীতু, ইস্কুলে থাকতে তা টের পাই নি কোনদিন। সেই যে বাপের ধমক খেয়ে সে কেবিনে ঢুকেছিল ঝড়ের আগে, লণ্ডনে পৌঁছোনোর আগে আর বেরুলো না সেখান থেকে। কেবিন আমাদের আলাদা, খাবার দিয়ে যায় যে-খানসামা, তার মুখে শুনলাম স্টিভ সুস্থ নেই মোটেই। অসুস্থ লোককে বিরক্ত করা ঠিক নয়। আমি তাই একখানা চিরকুট লিখে পাঠালাম শুধু, তার আরোগ্য কামনা করে। চিরকুট নিয়ে গেল ঐ খানসামাই।

যা হোক, হতশ্রী সী-নিম্ফ তিন দিন পরে কোনরকমে গিয়ে পৌঁছালো লণ্ডনে। ডেক থেকে কিছু মাল ভেসে গিয়েছে বটে, কিন্তু খোলের ভিতরকার সব কিছুই থানে-থান বজায় আছে। নির্দিষ্ট আড়তে সেগুলি পৌঁছে দেওয়া, ভাড়াপত্র আদায় করা ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে কাপ্তেন এবং তাঁর লোকজন সবাই ব্যতিব্যস্ত। আমার আর স্টিভের কিন্তু অখণ্ড অবসর। আমরা সারাদিন শহরই দেখে বেড়াচ্ছি।

শহর? পার্লামেণ্ট বাড়ি, সেণ্ট পল, ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে—এই রকম কয়েকটা জিনিস যা না দেখলেই নয়, তাই শুধু দেখলাম আমি। তারপর স্টিভকে একা ছেড়ে দিয়ে আমি কেবল টহল দিতে

থাকলাম বিরাট ডক-এলাকার জেটিতে জেটিতে গলিতে গলিতে। কত দেশের কত জাহাজ! গঠনেরই বা কত বৈচিত্র্য, পতাকারই বা কত রকমফের! আর কত নতুন নতুন ভাষায় কথা কইছে নাবিকেরা! এ যেন এক আলাদা পৃথিবী!

আর আশ্চর্য এই, এ-পৃথিবী আলাদা হয়েও যেন আমার আপন। এর সঙ্গেই যেন নাড়ীর বাঁধন অচ্ছেদ্য আমার! যা-কিছু দেখি, সবই যেন সুন্দর লাগে! সবকিছুর ভিতর থেকেই বৃহৎ বিশ্ব যেন হাতছানি দেয় আমাকে—"ঘরের বাঁধন ফেলে, আয় চলে, আয় আমার পাশে!"

মন আমি স্থির করে ফেলেছি। ঘরের বাঁধন যা কেটে বেরিয়েছি, আর তা নতুন করে পরবার জন্য ঘরে আমি ফিরব না। জয়-যাত্রা যখন শুরু করেছি একবার, যাত্রাভঙ্গ আর করব না।

স্টিভকে বললাম—"তোর বাবাকে এইবার বল্ তুই, আমায় কাজে বহাল করে নিতে। বাড়ি আর যাচ্ছি না আমি।"

স্টিভ বলল—"তুইও চল্। কথা যা কইবার, আমিই কইব। তবু, তোকে একবার চোখে দেখা ত তাঁর দরকার! আমার ত মনে হয় না যে এ কয় দিনে তিনি তোর দিকে তাকিয়ে দেখার সময় পেয়েছেন। যা বিপদ আপদ গেল!"

আমি স্টিভের সঙ্গে চললাম কাজে কাজেই। দাঁড়ালাম গিয়ে কাপ্তেনের সমুখে। কাপ্তেন আমার দিকে চাইলেন। আমার যেন মনে হল, তাঁর সে দৃষ্টিতে সহানুভূতির লেশমাত্র নেই। তক্ষুণি নিজেকে বোঝালাম যে ও আমার মনের ভুল ছাড়া কিছু নয়। আমার উপর সহানুভূতি থাকবে না, এমন কী অপরাধ আমি করেছি তাঁর কাছে?

স্টিভ ওদিকে শুরু করেছে—"বাবা, আমার এই বন্ধু রবিন, তোমার ত মনে আছে—হাল থেকেই ও এসেছে আমাদের সঙ্গে—"

"মনে না-থাকবার জো কী?"—বিরস কণ্ঠে জবাব দিলেন কাপ্তেন।

সর্বনাশ! এ কথার মানে ত একটাই হয়! সে-মানে এই যে মনে না থাকলেই তিনি খুশী হতেন। অর্থাৎ আমার উপস্থিতি তাঁর কাছে ভাল লাগে নি। অর্থাৎ—

কথাটার মানে ঐরকমই আন্দাজ করে নিয়েছে স্টিভও। কী যে বলবে এর পরে, তা ঠাওরাতে পারছে না। অথচ কিছু একটা বলতে ত তার হবেই! সেই যখন দায়িত্ব নিয়েছে এ-ব্যাপারের! সে ঢোঁক গিলতে গিলতে বলল—"নাবিকের কাজে ভরতি হবার খুব ইচ্ছে রবিনের। আমি ওকে কথাও দিয়েছি যে বাবাকে বলে আমাদের জাহাজেই ওকে নিয়ে নেব।"

আর যায় কোথায়! বারুদের গাদায় যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে স্টিভ। কাপ্তেন হুংকার করে উঠলেন একেবারে—"কথা দিয়েছ? ডেঁপো ছেলে, কথা দেওয়ার তুমি কে? আমি ওকে কক্ষণো নেব না। ও অত্যন্ত অপয়া। ও অভিশপ্ত। এই সী-নিম্ফ নিয়ে ঘোরাফেরা করছি আমি বিশ বৎসর। এমন ঝড়ে কখনো পড়ি নি যে মাস্তুল কেটে জলে ফেলে দিতে হয়। ওর জন্যই এবার হল তা। ওর উপর অভিশাপ আছে। চাকরিতে ত নেবই না, ও যদি এই জাহাজে হাল যেতে চায় আবার, তাও নেব না ওকে। অন্য জাহাজে চড়বার পয়সা যদি ওর না থাকে, বরং সেটা তোমার খাতিরে আমি দিয়ে দিচ্ছি। কি সী-নিম্ফে ওর ঠাঁই আর হবে না।"

ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে রোষে চোখে আমার জল এসে গেল কোনরকমে একটা কথা শুধু বলতে পেরেছিলাম—"আপনি আমার উপর অবিচার করেছেন কাপ্তেন!" ব্যস, আর নয়। তক্ষুণি বেরিয়ে এলাম তাঁর ঘর থেকে, এবং নিজের কেবিনে টুকিটাকি জিনিস যা-কিছু নিজের ছিল তা নিয়ে সী-নিম্ফ থেকে নেমে এলাম গটগট

করে। স্টিভকে ধারে কাছে দেখলাম না, আমিও খুঁজলাম না তাকে। কেন আর বেচারীকে লজ্জা দেওয়া ?

নেমে ত এলাম, এখন করি কী ? বাড়ি ফিরে যাব ? ইচ্ছে ত নেইই, উপায়ও নেই। পকেটে সামান্য যা অর্থ আছে, তাতে ভাড়া দিয়ে হালে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। অসম্ভব যখন, তখন সে-চেষ্টায় সময় নষ্ট করব না। বরং দুই একদিন এই ডক অঞ্চলেই ঘোরাফেরা করে চাকরির খোঁজ করব। দুই একদিনের হোটেল-খরচাই আছে আমার পকেটে।

বগলে একটা ছোট্ট পুলিন্দা, হোটেলে হোটেলে ঘুরতে লাগলাম। সস্তা হোটেল অগুন্তি এখানটায়। খরিদ্দার সবাই নাবিক। যেখানে যখন যাই, পাশের লোকটির সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করে নিই। জিজ্ঞাসা করি—কোন্ জাহাজের নাবিক সে। সে জাহাজে নতুন লোক আর নেবে কিনা। আনকোরা নতুন লোক অর্থাৎ শিক্ষানবীশ—

ঐ শেষের কথাটিতেই সবাই মাথা নাড়ে। শিক্ষানবীশের প্রয়োজন কোন জাহাজেই নেই। করিৎকর্মা অভিজ্ঞ নাবিক হলে তার চাকরি পাঁচ মিনিটে জুটে যাবে, আমার মত আনাড়ী জেটিতে জেটিতে ধর্না দিয়েও করতে পারবে না কিছু। এরকম ছেলেদের পিছনে থাকা দরকার সুপারিশ, তা ত লণ্ডনে বসে আমার পক্ষে যোগাড় করা অসম্ভব !

দু'টো দিন এইভাবে কাটল। পকেটও খালি হয়ে এসেছে। কাল থেকে হয়ত উপোসই দিতে হবে। বাড়ি ফিরে যাওয়া ? সে ইচ্ছে ত নেই, থাকলেও তার উপায় নেই আর। ভাড়া কোথায় ? জাহাজে বল, ঘোড়ার ডাকগাড়িতে বল, ভাড়া না দিলে ত কেউ নেবে না আমায় ! এক একবার মনে হতে লাগল—স্টিভের বাবার কথাই ঠিক। আমি বুঝি সত্যিই অপয়া এবং অভিশপ্ত।

কোনদিকে কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না যখন,

হঠাৎই কিন্তু বরাত খুলে গেল সেই সময়। একটা হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছি, এক ভদ্রবেশী যুবকের সমুখে পড়ে গেলাম। তিনি বার বারই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন আমাকে। তাই দেখে আমি টুপি খুলে অভিবাদন করলাম। এবং তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই বলে ফেললাম—"কোন জাহাজে চাকরি খুঁজছি আমি। কাজ জানি না, শিখে নেব—"

ভদ্রলোক প্রথমে গম্ভীর হয়ে গেলেন, তারপরে একটু হাসলেন। তারপর বললেন—"অভিভাবকদের মত নেই বুঝি? বাড়ি থেকে পালিয়েছেন?"

সব কথাই অকপটে তাঁকে বললাম। এবং সেইখানে দাঁড়িয়েই চাকরিতে বহাল হয়ে গেলাম। ভদ্রলোকটি নিজেই কাপ্তেন একখানা ছোট জাহাজের, নাম রেনল্ড। "কোন কাজ আমার এখানে খালি নেই এখন"—বললেন কাপ্তেন রেনল্ড—"তবু আপনাকে আমি নিচ্ছি। ঠিক এই রকম একটি মোটামুটি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান আমার প্রয়োজন ছিল। জাহাজের কাজ শিখুন বা না শিখুন, সে আপনার ইচ্ছে। আপনার আসল কাজ হবে—নির্বান্ধব সমুদ্রযাত্রায় আমার বন্ধুর অভাব পূরণ করা।"

দুই

কাপ্তেন রেনল্ডের জাহাজ "ম্যাবাইনা"তে দু'টো বছর পরম সুখে কাটল আমার। স্টিভের বাবার যে-কাজ ছিল এঁরও তাই। তফাত এই যে এঁর জাহাজ উপকূল-বাণিজ্য নিয়েই ব্যাপৃত থাকে না, মাঝে মাঝে চ্যানেল পেরিয়ে ফরাসীদেশ, স্পেন, হল্যাণ্ড বা ডেনমার্কের এক একটা বন্দরেও পাড়ি জমায় মাল পৌঁছাবার জন্য।

স্টিভের বাবাও ভদ্রবংশীয়, রেনল্ডও তাই। কিন্তু দু'জনের শিক্ষা-দীক্ষা সামাজিকতায় আকাশপাতাল পার্থক্য। অত্যন্ত ভদ্র, বিবেচক ও সহৃদয় লোক এই রেনল্ড। ম্যাবাইনার নাবিকেরা এঁকে সম্মান করে রাজার মত, শ্রদ্ধা করে পিতার মত, যদিও বয়সে ইনি ত্রিশ পেরুতে পারেন নি এখনো।

জাহাজে মালপত্র থাকে। তা তো থাকবেই, কারণ মাল বইবার জাহাজ এটা। বন্দরে বন্দরে কত মাল নামে, কত মাল ওঠে আবার। কিন্তু জাহাজের উপর-ডেকে একটা কেবিন ভরতি এক শ্রেণীর মাল যে আছে, তা স্থানচ্যুত হয় না কখনো। সে সব হল বই। অন্ততঃ দুই হাজার বই রেনল্ডের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে সমুদ্রে সমুদ্রে। জাহাজ চালাবার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বহন করেও হাতে তাঁর অবসর থাকে প্রচুর, সেই সময়টা রেনল্ড এত কাল কাটাতেন এই মূক মিত্রদের সাহচর্যে। এখন সেটা তিনি ভাগাভাগি করে একাংশ দিতে শুরু করেছেন এই অধম রবিন ক্রুসোকে; কথায় বার্তায় গল্পে গুজবে আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছেন এভাবে যে আমি সব সময় মনে রাখতে পারি না যে এ জলযাত্রায় তিনি প্রভু, আমি কর্মচারী।

কর্মচারী? তা কর্ম আমি না করি, তা নয়। রেনল্ডের নির্দেশ এই যে আমি তাঁর হিসাবপত্র রাখব এবং লাইব্রেরিটাকে গুছিয়ে

রাখব। তা করেও আমি জাহাজের অন্য কাজ যথেষ্ট করে থাকি। কাপ্তেনের হুকুমে নয়, নিজের গরজে। সুযোগ যখন মিলেছে, তার সদ্ব্যবহার না করব কেন? খালাসীর কাজ থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ার এবং কাপ্তেনের কাজ সবই মোটামুটি শিখে নিলাম বছর দুইয়ের মধ্যে।

এই দুই বৎসরে লণ্ডনে আমরা এসেছি অন্ততঃ ছয় বার। প্রতিবারে এক এক মাস বিশ্রাম পেয়েছি। রেনল্ড বিবাহিত, দু'টি ছেলেমেয়েও তাঁর আছে। প্রথম প্রথম দুই একবার রেনল্ড আমাকে বলেছিলেন বাড়ি গিয়ে ছুটিটা কাটিয়ে আসতে। আমিই রাজী হই নি। অজুহাত দেখিয়েছিলাম বাড়ি গেলে আমি ফিরতে পারব না। কারণ আমার এই জাহাজের চাকরি বাবা-মার একান্ত অপছন্দ। অজুহাতটা যে মিথ্যা, তা নয়। বাবা-মাকে আমি ভালবাসি বটে, কিন্তু সমুদ্রকে এবং পর্যটকের জীবনকে ভালবাসি আরও বেশী। বাড়ির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজের স্বাধীনতাকে আমি বিসর্জন দিতে পারি না।

বাড়ি আমি কিছুতেই যাব না দেখে রেনল্ড ছুটির সময়গুলোতে আমাকে তাঁর বাড়িতেই নিয়ে যেতে থাকলেন অতঃপর। সেখানে পরিচিত হলাম তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। যেমন স্বামী, তেমনি স্ত্রী। পরকে আপন করে নেওয়ার, আশ্রিতকে সমকক্ষের মর্যাদা দেওয়ার ক্ষমতায় এই মহিলার জুড়ি আমি দেখি নি। এঁর কথা পরে আরও বলছি।

দু'টো বৎসর পরম সুখেই কাটল আমার। তারপর আমার মস্তকে হল বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। একবার ছুটির সময় সামান্য অসুখে রেনল্ড মারা গেলেন। আমি শোক পেলাম ত বটেই, নিজেকে নিঃসহায় মনে করতে লাগলাম চারিদিক দিয়েই। আমার বলবুদ্ধি ভরসা সবই ছিলেন রেনল্ড, একাধারে আমার বন্ধু ও অভিভাবক ছিলেন তিনি, তার অভাবে দিশেহারা হয়ে পড়লাম নোঙ্গর-ছেড়া নৌকোর মত।

এর পর শোকের আঘাত যখন কমে এল একটু একটু করে, মিসেস রেনল্ড একদিন আমায় ডাকলেন কিছু আলাপ আলোচনার জন্য। বৈষয়িক আলোচনাই অবশ্য। কাপ্তেন নেই, কিন্তু ম্যারাইনা রয়েছে। ওকে এখন চালায় কে? আজেবাজে অপরিচিত লোকের হাতে জাহাজ এবং ব্যবসা ছেড়ে দিতে সাহস নেই মিসেসের। আমি ও কাজের ভার নিতে সাহস করি কিনা, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে।

খুবই প্রলোভনে পড়ে গেলাম, তা ঠিক। কিন্তু জাঁক না করেও বলতে পারি সে-প্রলোভন দমন করবার মত নৈতিক শক্তি আমার ছিল। আমি বিনীত কিন্তু দৃঢ়ভাবে বললাম যে সে-সাহস আমার নেই। জাহাজ চালাবার বা ব্যবসা চালাবার ক্ষমতা আমার মোটেই নেই। অনভিজ্ঞের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া মানে লোকসান খাওয়া। যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে, তেমন কাজ করতে মিসেস রেনল্ডকে আমি কখনোই পরামর্শ দেব না।

আমার এই সহজ সরল উক্তি শুনে মিসেস দুঃখিতও হলেন যেমন, প্রীতও হলেন তেমনি। প্রীত হলেন অবশ্য আমার নিঃস্বার্থতায়, কিন্তু দুঃখিত হলেন এই ভেবে যে স্বামীর এত প্রিয় জলযানখানাকে এবার বেচে না দিয়ে আর উপায় থাকবে না। অজানা অচেনা লোকের উপর অপরিমিত বিশ্বাস স্থাপন করতে তাঁর সাহস নেই। সুতরাং ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া এবং জাহাজখানা বেচে দেওয়াবই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন। অবস্থা গতিকে আমিও পূর্ণ সমর্থন জানালাম সে-সিদ্ধান্তে।

এইবার আসা যাক আমার ব্যক্তিগত কথায়। রেনল্ড আমাকে বেতন দিতেন মাসিক পনেরো পাউণ্ড। তার উপর লভ্যাংশের একটা বখরা সমস্ত কর্মচারী যেমন পেত, আমিও তেমনিই পেতাম। কিন্তু পাওনাগণ্ডার মধ্যে সামান্যই আমি নিয়েছিলাম এ-যাবৎ। বস্তুতঃ পোশাক-আশাকের খরচা ছাড়া অন্য ব্যয় ত

আমার ছিলই না কিছু! কাজেই সমস্ত অর্থই কাপ্তেনের কাছে জমছিল আমার। মিসেস হিসাব করে বললেন—প্রায় পাঁচশো পাউণ্ড আমার মজুত রয়েছে তাঁর স্বর্গত স্বামীর তহবিলে। তিনি তখুনি তা দিয়ে দিতে চাইলেন।

কিন্তু আমি তাতে রাজী হলাম না। বললাম যে ওটা তিনিই যদি নিজের হেফাজতে রাখেন, আমি বাধিত হব। প্রয়োজনমত নেব আমি, ভবিষ্যতে কোন এক সময়। আপাততঃ আমি ত লণ্ডনে বা অন্য কোথাও স্থিত হয়ে বসছি না। সমুদ্রভ্রমণের শখ আমার মেটে নি। বৃহৎ পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে ফিরে দেখার যে আগ্রহ আমায় গোড়ায় ঘরছাড়া করেছিল, তার ত আংশিক চরিতার্থতাও হয় নি এ-যাবৎ! ঘরের বাঁধন কাটিয়ে এসে বন্ধুর স্নেহের বন্ধনে আটকে পড়েছিলাম, এবার ত আর কোথাও কিছু নেই আমায় বেঁধে রাখবার, এবার আমি পাড়ি জমাব নিরুদ্দেশের দরিয়ায়। যদি কখনো ফিরি, মিসেসের কাছ থেকে অর্থ টা নিয়ে যা হোক কিছু করব তখন। না যদি ফিরি, তিনি ওটা ও দানখয়রাত করে দিতে পারবেন নিজের বিবেচনা-মত!

ম্যারাইনা বিক্রি হয়ে গেল। আমিও অন্য জাহাজে কাজ নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এবার আর তেমন অন্ন ভিক্ষা ধনুর্ভঙ্গ অবস্থা নয় যে সামনে যে-কাজ পাব, তাই ধরবে চুলে আঁকড়ে। এমন কাজ খুঁজতে লাগলাম, যাতে জীবিকারও সংস্থান হবে, পর্যটনের শখও মিটবে। দূরদেশযাত্রী কোন জাহাজে চাকরি চাই আমার।

খুঁজতে খুজতে পেলাম তেমনি চাকরি একটা। "ইস্প্রান্স" জাহাজে তৃতীয় মেট। দুই বৎসর ম্যারাইনাতে মেট-এর কাজ করেছি বলে মিসেস রেনল্ড সুপারিশ চিঠি দিয়েছিলেন, তারই জোরে চাকরি। বেশ বড় জাহাজ একখানা, নাবিকের সংখ্যাই জনা চল্লিশ। এটিও বাণিজ্য-জাহাজই বটে, তবে এর কাজ কারবার

মধ্য প্রাচ্য পর্যন্ত প্রসারিত। মনে মনে আমি খুব খুশী। স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রীস, তুর্কী মুলুক, সব দেশের সব বন্দরেই ত থামতে থামতে যাবে জাহাজ, মোটামুটি শহরগুলো দেখে নিতে পারব নিশ্চয়।

মিসেস বেনণ্ডই এখন একমাত্র আত্মীয় এ-জগতে। সাশ্রুনেত্রে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে ইস্তাম্বুলে গিয়ে উঠলাম। লণ্ডন, ডোভার, ইংলিশ প্রণালী হয়ে ফরাসীদেশের উপকূল ঘেঁষে চললাম আমরা। জাহাজের কাজ ম্যারাইনাতে মোটামুটি শিখে নিয়েছিলাম, নিজের কর্তব্যটুক ক্যাপ্টেনের চাহিদা-অনুযায়ী করে যাওয়া কিছুমাত্র শক্ত হল না আমার পক্ষে

ইস্তাম্বুল তিনখানা পাল তুলে চলেছে পোর্তুগীজ উপকূল ধরে, আমারই পাহারা তখন। বেলা আন্দাজ চারটে, দূরবীন চোখে দিয়ে আকাশের দিকে তাকাতেই এক টুকরো মেঘ দেখতে পেলাম। এমন কতই ত টুকরো মেঘ আকাশে দেখা দেয়, আবার মিলিয়েও যায়, প্রাথমিক স্তরে কে গ্রাহ্য করে তাদের? আমি কিন্তু অগ্রাহ্য করতে পারলাম না এই বিশেষ মেঘশিশুকে, গোখরোশিশুর মত তাকে অশেষ বিপদের সম্ভাব্য উৎস বলে মনে হল আমার। আমি গিয়ে ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করলাম, ডেক-এ এসে আকাশটা পর্যবেক্ষণ করবার জন্য।

ক্যাপ্টেন বেনণ্ড সার্থক শিক্ষা দিয়েছিলেন আমাকে, আমার আশঙ্কা যে অমূলক, এমন কথা ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসও বললেন না—"হয়ত তোমার ধারণাই ঠিক। মেঘখানার রঙ খারাপ। লক্ষ্য রাখো—" বলে তিনি তখনকার মত কেবিনে চলে গেলেন।

আমার ডিউটি পাঁচটা পর্যন্তই। যখন আমি ডেক থেকে চলে গেলাম দ্বিতীয় মেটকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে, তখন মেঘখানা বেশ বড় হয়ে উঠেছে। আমি তাকে বলে গেলাম—"ক্যাপ্টেন বলেছেন ঐ

মেঘটার উপরে নজর রাখতে। তেমন তেমন বুঝলে কাপ্তেনকে খবর দিও, তাঁরই আদেশ এটা—"

সাতটা নাগাদ সেই টুকরো মেঘখানা সারা আকাশে ছড়িয়ে দিল নিজেকে। আর কী নিকষকালো নিবিড় আঁধারে ডুবিয়ে দিল উপরে মহাশূন্যকে আর নীচে মহাসমুদ্রকে! কাপ্তেন সব পাল নামিয়ে ফেললেন, নিজে এসে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সেই অসময়ে, কারণ ঝড়ের গর্জানি শোনা যাচ্ছে আকাশের কোন এক অদৃশ্য রন্ধ্র থেকে। এটা সে-ঋতু নয়, যখন এ-উপকূলে ঝড়ের তাণ্ডব হামেশাই হয়। অকালের এই অলক্ষুণে মেঘডম্বর দেখে ঝানু কাপ্তেন উইলিয়ামসও ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

ঝড় এল, প্রমত্ত দানবসেনার মত হুংকার করতে করতে। জাহাজখানাকে শূন্যে তুলে দিল এক ধাক্কায়, আবার পাতালে ডুবিয়ে দিল এক লাথি মেরে। প্রতি মুহূর্তেই মনে করছি এই বুঝি শেষ মুহূর্ত, এই বুঝি কাত হয়ে পড়ল ইস্তাম্বুল। কিন্তু তা পড়ল না সে, ছুটতে লাগল টলতে টলতে অন্ধ বুনো মোষের মত। ঢেউয়ের পরে ঢেউ গড়িয়ে যাচ্ছে ডেক-এর উপর দিয়ে, দড়িদড়া ভেসে গেল, হাল ভেঙে দুই টুকরো, নাবিকও দুই একজন সলিলসমাধি লাভ করেছে বলে সন্দেহ হতে লাগল।

তিন দিন তিন রাত্রি চলল সেই মহাঝটিকা। দিনের বেলায়ও সূর্যের মুখ দেখল না কেউ, একটা ধূসর আধ-আলোর আভাস মাথায় নিয়ে কালো কালো মত্ত মাতঙ্গের মত আদিগন্ত নেচে বেড়াতে লাগল আথাল পাথাল বিশাল বিশাল ঢেউ। কাপ্তেন মাথা চাপড়াচ্ছেন ক্রমাগত। কম্পাসটা ঠিকই আছে, জাহাজ যে জিব্রাল্টর পেরিয়ে দক্ষিণে ছুটে চলেছে, তাতে সন্দেহ নেই। আটলান্টিকের দুস্তর পারাবার আমাদের সম্মুখে। বাঁয়ে অন্ধ মহাদেশ আফ্রিকা।।

তিন দিন তিন রাত্রি এইভাবে কাটল সূর্যচন্দ্রহীন চিরপ্রদোষের রাজ্যে। চতুর্থ দিন সকালে সে-ঝড় থামল, তরঙ্গদানবেরা মাথা

নীচু করতে লাগল একে একে। সূর্য উঠেছে, কিন্তু আলো তার ম্রিয়মাণ, ঝড়ের ভয় যেন তার কাটে নি এখনো।

সেই মরা আলোতেই ইতস্ততঃ দূরবীন ঘোরাচ্ছেন কাপ্তেন। কোথায় এলেন, তারই কিছু হদিস যদি পাওয়া যায়, এই আশায়। হঠাৎ তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, প্রথম মেট রোজার্সকে ডেকে বললেন—"একটা জাহাজ দেখতে পাচ্ছি। ঝড়ে ওদের কোন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। এদিকে দুর্যোগটা খুব সাংঘাতিক হয় নি বোধ হয়।"

রোজার্সই এ-জাহাজের সবচেয়ে অভিজ্ঞ নাবিক। কাপ্তেনের হাত থেকে দূরবীন নিয়ে তিনি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন দূরবর্তী জাহাজখানার পানে। তারপর চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে বললেন—"কাপ্তেন! আপনি অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে ওদের মাস্তুলে কোন পতাকাই নেই?"

"পতাকা নেই?"—কাপ্তেন তাড়াতাড়ি দূরবীন টেনে নিলেন রোজার্সের হাত থেকে—"নেই-ই ত। আগে ত আমি লক্ষ্য করি নি ওটা! সাহায্য পাওয়ার আশায় এমন উৎফুল্ল হয়েছিলাম আমি যে ঐ জরুরী বিষয়টাই খেয়ালে আসে নি।"

দূরবীন এদিকে ঘোরান, ওদিকে ঘোরান, আর মুখ তাঁর ক্রমশঃ কালো হয়ে আসে। রোজার্স যেন আপনমনেই বলছেন—"আফ্রিকার উপকূল! জলদস্যু নয় ত?"

"নিশ্চয় জলদস্যু"—জোর দিয়ে বলে উঠলেন উইলিয়ামস, "সারি সারি কামান দেখতে পাচ্ছি ওদের।"

"ভাগ্য এবার বিরূপ"—জবাব দিলেন রোজার্স—"ঝড়ের গ্রাস থেকে যদি-বা বেঁচে গেলাম, এবার পড়া গেল বোম্বেটের খপ্পরে। যা করেন যীশু!"

উইলিয়ামস ক্ষণিকের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিলেন মন থেকে—"যা করেন যীশু—তা ত বটেই! তবে আমাদের যা করবার,

তা ত আগে করা চাই! সব তৈরী হতে বলুন ওদের। বন্দুকগুলো ঠিক আছে ত? বারুদঘরে ত জল ঢোকে নি জানি!"

সে কী দারুণ আতঙ্ক সারা জাহাজে! "বোম্বেটে! বোম্বেটে!" —ফিসফিসানি চারিদিকে। ঝড় থেকে নিস্তার পাওয়ার আনন্দ পলকে উবে গেল নাবিকদের মন থেকে। ঝড় যে এর চেয়ে শতগুণে ভাল ছিল। তার হাত থেকে বাঁচন আছে, এই ত ইস্তাম্বুল টিকে গিয়েছে, তিন দিনের খণ্ডপ্রলয় মাথার উপর দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও! তা ছাড়া, জাহাজডুবিই হত যদি, সে-মরণও ত বোম্বেটের হাতে পড়ার চেয়ে শ্রেয়ঃ ছিল। এক লহমায় সব যন্ত্রণার শেষ হত জলে ডুবলে। দাসত্বের যন্ত্রণা যে জীবনব্যাপী! বোম্বেটেরা যাদের ধরে, তাদের বেচে দেয় ক্রীতদাসের বাজারে। তেমন বাজার মধ্যপ্রাচ্যের সব শহরেই আছে। আছে উত্তর আফ্রিকাতেও।

সাজ সাজ রব জাহাজে। ডেক ঝাঁট-পাট দিয়ে পরিষ্কার করা হল। দুটো ছোট কামান আছে ইস্তাম্বুলে, তাদের মুখ খোলা সমুদ্রের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। বারুদঘর খুলে দিলেন কাপ্তেন, গুলি বারুদ এনে ডাঁই করা হল হাতের কাছে। নাবিকেরা মাথা-পিছু বন্দুক পেলো একটা করে, অবশ্য যারা গুলি চালাতে জানে, তারাই।

সমুদ্রপথে জলদস্যুর উৎপাত খুব বিরল নয়। কাজেই দীর্ঘ-পথের যাত্রী প্রত্যেক জাহাজেই পর্যাপ্ত সংখ্যক বন্দুকের সংস্থান থাকেই। আর নাবিকদের কাজে বহাল করার সময় প্রশ্নও করা হয় যে বন্দুক ধরার শিক্ষা সে পেয়েছে কিনা। পাকা লড়ুয়েরা সব ক্ষেত্রেই চাকরি পায় সহজে।

এদিকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুতি চলছে, ওদিকে পালানোর চেষ্টারও ত্রুটি নেই। অবশ্য সে-চেষ্টার সুযোগ খুব বেশী পাচ্ছেন না কাপ্তেন, তাঁর মাস্তুলগুলি সব কেটে নামিয়ে দিতে হয়েছিল ঝড়ের সময়। এখন পাল খাটানো যাবে কিসে? অত-বড় জাহাজ ত আর দাঁড় টেনে চালানো যায় না!

দেখতে দেখতে বোম্বেটে জাহাজও এসে পড়ল নিকটে। এখন আর দূরবীন লাগছে না, সাদা চোখেই দেখা যাচ্ছে মাঝারি কলেবরের জলযানটাকে। সাদায় কালোয় মেশানো রং তার, নকশাটাই ভয়াবহ। পতাকা? না, সত্যিই এতক্ষণ পতাকা বলতে কিছু ছিল না বোম্বেটেদের। এইবার কিন্তু ওরা তুলে ধরেছে একটা কালো পতাকা। তা দেখেই ইস্তাম্বুলের লোকেদের বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে গেল। দু'খানা লম্বা হাড় কোনাকুনি বসানো, তার উপরে একটা মড়ার মাথা দাঁত বার করে হাসছে। বোম্বেটেদের চিরন্তন পরিচয়-পত্র, কালো জমিনে সাদা হাড় আর মড়ার মাথা!

এসে পড়ল ওরা। ওদের ত মাস্তুল বা পাল নষ্ট হয় নি! অনুকূল হাওয়ায় চারখানা ছোট-বড় পাল এক সাথে তুলে দিয়ে সাঁ সাঁ করে ওরা এসে পড়ল। আর বন্দুকের পাল্লার ভিতর ওরা আসতেই কাপ্তেন হুকুম দিলেন—"বেজোড় সংখ্যারা চালাও গুলি।"

ইতিপূর্বেই সব নাবিক রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল লাইন করে। আমিও অবশ্য আছি সে-লাইনে। এক, দুই, তিন গুনে গুনে নিজের নিজের সংখ্যাও তারা স্থির করে নিয়েছে। সুতরাং বেজোড় সংখ্যা কারা, তা আগে থেকেই জানা আছে তাদের। তারা হুকুম পাওয়া মাত্রই চালাল বন্দুক।

আমি হচ্ছি ছয় নম্বর, সুতরাং আমার কাজ এখন চুপ করে অপেক্ষায় থাকা, অবশ্যই কাপ্তেনের দ্বিতীয় আদেশ আসবে জোড় সংখ্যাদের উপরে। আমরা দমবন্ধ করে আছি সেই আদেশের প্রতীক্ষায়—

বেজোড়েরা চটপট বন্দুকে গুলি ভরে নিচ্ছে ততক্ষণ—

এমন সময়ে আকাশ আর সমুদ্র দু'টোই কাঁপিয়ে কামান দাগল বোম্বেটেরা। ওদের কামান আমাদের চাইতে অনেক বড়, দেগেছেও তারা অন্ততঃ গোটাচারেক এক সঙ্গে, আমাদের ডেক-এর অর্ধেকখানাই উড়ে গেল ওদের প্রথমবারের গোলন্দাজিতে।

অর্ধেকখানা ডেক উড়ে গেল। তার সঙ্গে সেই সব নাবিক, যারা দাঁড়িয়েছিল ডেক-এর সমুখ দিকে। বলতে গেলে বন্দুকধারীরা সবাই ছিল সেই দলে, তাদের মধ্যে আমিও একজন। ডেক উড়ে গেল। হতাহত হল আমাদের অনেকে। হত বা আহত না হয়েও অনেকে সবেগে নিক্ষিপ্ত হল গিয়ে সমুদ্রের ভিতর। ইস্তাম্বুলের অবস্থান থেকে অন্ততঃ দু'শো গজ দূরে।

এই নিক্ষিপ্তদের মধ্যে ছিলাম আমিও, শ্রীমান রবিনসন ক্রুশো। বন্দুক কোথায় ছিটকে পড়েছে হাত থেকে, তা কে জানে। জলে পড়েই তলিয়ে গিয়েছিলাম, ভেসে উঠবার পরে দেখি বন্ধুরা অনেকেই আশে পাশে ভাসমান। কয়েকজন আছাড়ি-বিছাড়ি খেতে খেতে ডুবে গেল ধীরে ধীরে। তাদের আশে পাশে জলটার রং লাল দেখে বুঝলাম, তারা জখম হয়েছিল কামানের গোলায়। নিহতেরা ত অনেক আগেই ডুবেছে, আর ওঠে নি।

কাপ্তেন উইলিয়ামস তখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। ডেক-এর যে অংশ উড়ে যায় নি, তারই উপরে তিনি আছেন, মেট রোজার্স ও আছেন। আর আছে দু'টো কামানের একটা। সেই কামানটা নিজের হাতে দাগলেন কাপ্তেন, আমি স্বচক্ষে দেখলাম। তার পরে বোম্বেটে জাহাজ থেকে কামানের গোলা এল আর এক ঝাঁক। ইস্তাম্বুল জাহাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সমুদ্রের বুক থেকে। কাপ্তেনকে বা মেটকে কোনদিকে আর দেখতে পেলাম না। জলে হয়ত তাঁরা পড়েন নি, রেণু রেণু হয়ে উড়ে গিয়েছেন হাওয়ায়।

এখন আর মাঝখানে ইস্তাম্বুল নেই। ওদিকে ছুটন্ত বোম্বেটে জাহাজ, এদিকে সমুদ্রতরঙ্গে হাবুডুবু আমরা বারো চোদ্দ জন নাবিক। আমাদের এখন হয় ডুবতে হয়, নয় আশ্রয় চাইতে হয় ঐ পরম শত্রুদের কাছেই। মজার কথা--এই সময়ই মনে পড়ে গেল বাবার একটা সতর্কবাণী। বহুদিন আগে, প্রথম যেদিন তাঁর

কাছে কথা তুলেছিলাম যে আমি সমুদ্র পর্যটনে যেতে চাই, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—"তা যদি যাস, নির্ঘাত বেঘোরে প্রাণ হারাবি।"

অকাট্য অভিশাপ! অমোঘ সত্য! বেঘোরেই প্রাণ হারাতে বসেছি আজ।

বেশী কথায় আর কাজ কী! বোম্বেটেরা এলো, আমরা ছাগ-শিশুর মত কশাইয়ের ছোরার সামনে গলা বাড়িয়ে দিলাম। ওদের নৌকা এসে আমাদের একে একে নৌকায় তুলল, আর সঙ্গে সঙ্গে বেঁধে ফেলল পিছমোড়া করে। দড়িদড়া ওরা সঙ্গেই এনেছিল। নিখুঁত ব্যবস্থা ওদের।

বোম্বেটে জাহাজে যত দিন ছিলাম, হাত আর পায়ের শিকল একসাথে ওরা খোলে নি কখনো। তবে খাওয়ার কষ্ট ছিল না। ওরা নিজেরা খায় ভাল, আমাদেরও পেট ভরে খেতে দিত। আমাদেরই জোনাথন তিক্ত হাসি হেসে বলেছিল একদিন—"ভাল করে না খাওয়ালে ওদেরই ত লোকসান! রোগা হয়ে যাই যদি আমরা, বেচে ত বেশী পয়সা পাবে না!"

সত্যিই বিক্রি হয়ে গেলাম একদিন।

উপকূলে এক জায়গায় ভিড়ল বোম্বেটে জাহাজ, দিন দশেক পরে। জায়গাটা পাহাড়ে জঙ্গলে ঢাকা, লোকালয় কাছাকাছি কোথাও আছে বলে মনে হল না। কয়েকজন দালাল এলো সেখানে ডিঙ্গি চড়ে। কথায় বার্তায় হজরত মুসার নাম ঘন ঘন কপচাচ্ছে, তাইতে মনে হল ওরা ইহুদী হবে হয়ত।

যা হোক, ওরা আমাদের সবাইকে নিয়ে গেল, অনেক পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে লাংচু নামের একটা ছোট শহরে। শহর ছোট হলে কী হবে, দাসের বাজার আছে একটা, সেখানেই বিক্রি হয়ে গেলাম আমরা। আমার সঙ্গীরা সবাই আমার চেয়ে বলবান সুপুষ্ট, তারাই বিক্রি হল বেশী দামে। সব চেয়ে কম দাম উঠল আমার, কিনল

এক দাড়িওয়ালা শেখ। পরে জেনেছিলাম, সে তার নিজের জন্য কেনে নি আমায়, দাস রাখবার মত ধনী সে নয়। তার মনিব একজন আমীর লোক, তাঁরই চাহিদা-অনুযায়ী বেসাতি করতে সে এসেছিল লাংচুতে। আমীর চেয়েছিলেন সুশ্রী চেহারার ইউরোপীয় ছোকরা একটি। কিন্তু ছোকরা আমাদের এই দলটাতে একটিও ছিল না, বাধ্য হয়ে সব-চেয়ে কমবয়সী যাকে দেখেছে, তাকেই কিনে ফেলেছে শেখ।

আমাদের দলের এক এক জনকে এক এক দিকে যেতে হল নতুন মনিবের সঙ্গে। সে-মর্মস্পর্শী বিদায়ের দৃশ্য এখনো যেন চোখের উপরে ভাসছে। ইস্তাম্বুলের উপরে যতদিন ছিলাম আমরা, পরস্পরে এমন-কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল না আমাদের। অন্ততঃ আমার সঙ্গে কারোই না। তার কারণ, আমি ছিলাম ওদের এক ধাপ উপরের লোক, পদগৌরবে তৃতীয় মেট। কিন্তু আজ? দুই হপ্তার বন্দীজীবনে আমরা সবাই পরস্পরের এত কাছে এসে গিয়েছি যে বিদায়ের ব্যথা সকলেরই প্রাণে বাজল পরমাত্মীয় বিয়োগের মত। আমার বেশ মনে পড়ে আমি ওদের অন্ততঃ তিন চারজনের গলা জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেলেছিলাম সেদিন। তাদেরও সেই অবস্থা।

দাড়িওয়ালা শেখ আমাকে ঘোড়ায় তুলল প্রথমে, তারপরে উটে। বেশ খানিকটা দূর চলতে হল এমন একটা জায়গা দিয়ে, যাকে মরুভূমি বললে অন্যায় হয় না। উটের প্রয়োজন তারই জন্য।

উট ছেড়ে দিয়ে এবার চড়লাম নৌকোয়। গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নদী একটা, সেটা আমাদের নিয়ে ফেলল একেবারে সমুদ্রে। এইখানে ছোট একটা কেল্লা। আমার মালিক হয়েছেন এই কেল্লারই অধিপতি মুস্তোফা শোহরবন্দ কিরঘিজ। আশে পাশে অনেক পাহাড় জঙ্গল আর তার ফাঁকে ফাঁকে দুই চারখানা

গ্রাম, এই নিয়ে আমীর কিরঘিজের জমিদারি। তিনি নিজে অবশ্য ওটাকে রাজ্য বলেন, জমিদারি না বলে।

আমাকে দেখে আমীর মোটেই খুশী হলেন না। তিনি চেয়েছিলেন একটা ফুটফুটে বালক, তা ত পেলেন না, পেলেন একটা দাড়িওয়ালা ষণ্ডামার্কা যুবক। বালক দরকার ছিল মদের পেয়ালাটা এগিয়ে দেওয়ার জন্য, হাত পা টেপার জন্য, বেগম-মহলে সন্দেশ নিদেশ পৌঁছে দেবার জন্য। আমার দ্বারা ত এসবের কোনটাই ভাল ভাবে উতরাবে না। রেগে মেগে দালাল শেখসাহেবকে উনি বেয়কুফ গিদ্ধর প্রভৃতি চোখা চোখা জবানে তিরস্কৃত করলেন অনেকক্ষণ ধরে।

তবে যা হয়ে গিয়েছে, তার ত আর চারা নেই। বিবেচক লোক, রাগটা পড়ে গেলে ভাবতে বসলেন—আমার দ্বারা কী কী কাজ করানো সম্ভব। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী তিনি জানেন একটু, কায়রোতে ছিলেন একসময় নবীন যৌবনে।

তার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি জানালাম—বন্দুক পেলে শিকার করতে পারি, ছিপ পেলে মাছ ধরতে পারি, ছাত্র পেলে ইংরেজী পড়াতে পারি।

এই তিন কাজের মধ্যে দ্বিতীয়টাই তিনি দিলেন আমাকে। নদীর মাছ অবশ্য তিনি খেতে পান, কিন্তু সমুদ্রের মাছ পান না। কারণ তাঁর প্রজারা সমুদ্রকে ভীষণ ডরায়। জান কবুল, কিন্তু তারা নৌকো নিয়ে সমুদ্রে বেরুবে না মাছ ধরবার জন্য।

আমি সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম মাছ ধরতে। বেশ বড় একখানা দেশী নৌকা আমীর ছেড়ে দিলেন আমাকে ঐ কাজের জন্য। অবশ্য একা আমাকে যেতে দেবেন না। একটা পাইক থাকবে, যাতে আমি না পালাই, তাই দেখবার জন্য। আর একটা ছোকরা থাকবে, জাল টেনে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য।

মাস ছয় আমি খুবই মাছ খাওয়ালাম আমীরকে। সত্যিই মাছ

ধরার কাজে ওস্তাদ আমি। তাতে এখানকার সমুদ্রের মাছগুলো খানিকটা বোকাও। কেউই ত এতদিন ধরেনি তাদের !

অঢেল মাছ খেতে পেয়ে আমীর আমার উপর খুশী। একদিন খোশমেজাজে বলে বসলেন—"রবিউল্লা (উনি এই নামই দিয়েছেন আমাকে), তুমি যদি বে-থা করে সংসারী হতে চাও এখানে, আমি মেয়েও যোগাড় করে দিতে পারি, দাসত্ব থেকে মুক্তিও দিতে পারি তোমায়—"

আমি ত একেবারে বিগলিত—"মালিকের দয়ার সীমা নেই। তার চেয়ে জোর বরাত আমার কী হতে পারে ? তবে মুক্তি পেলেও মালিকের জন্য মাছ ধরার কাজ আমি কিছুতেই ছাড়ব না—"

মালিক হেসে গড়িয়ে পড়লেন—"ঠিক আছে, ও-চাকরি তোমার সারাজীবন থাকবে রবিউল্লা !"

তার পরের দিন মাছ ধরতে গিয়ে ভারী যেন বেপড়তা পড়ে গেল আমার। জাল ফেলি, মাছ ওঠে না। ছিপ ফেলি, মাছ খায় না। আমি ছোকরাটাকে কেবলই বলি—"আরও এগিয়ে চল্‌' এসব জায়গায় রোজ ধরি মাছ, মাছেরা সেয়ানা হয়ে গিয়েছে।"

এই রকম ভাবে নৌকোটা সেদিন অনেক দূরে নিয়ে গেলাম আমি। তার পরই ভগবান স্মরণ করে করলাম এক কাণ্ড। রোজকার মত পাইক একটা আজও নৌকায় ছিল। সুযোগমত পিছন থেকে তাকে দিলাম প্রচণ্ড এক ধাক্কা। সে উলটে জলে পড়ে গেল। অমনি এক লোহার ডাঙ্গশ আমি উচিয়ে ধরলাম তার মাথার উপরে। এটা আমি আগে সংগ্রহ করে নৌকোর খোলে লুকিয়ে রেখে-ছিলাম। যেমন রেখেছিলাম—সামান্য কিছু খাবার আর এক কলসী জল।

ডাঙ্গশ তুলে আমি পাইককে বললাম—"বেশী পথ আসি নি।

তুই সাঁতার দিয়ে অনায়াসে কূলে ফিরে যেতে পারবি। যদি নৌকোয় ওঠার চেষ্টা করিস আবার, মাথা দু-ফাঁক করে দেব ডাঙ্গশের এক ঘায়ে।"

লোকটা দ্বিরুক্তি না করে কূলের দিকে ফিরল। আমি যে মরিয়া বনে গিয়েছি, সত্যি সত্যি ডাঙ্গশ মারতে যে আমি দ্বিধা করব না প্রয়োজন হলে, তা সে বুঝে ফেলেছে ততক্ষণ।

তারপর ডাঙ্গশ হাতে নিয়ে জুরীর দিকে ফিরতেই (ছোকরাটার ঐ নাম), সে হেসে ফেলল—"আমি তোমার সঙ্গেই পালাব। আমিও দাস কিনা!"

তিন

পালিয়েছি শেষ পর্যন্ত। এখন শেষ রক্ষা হলে হয়।

একটা ভরসা এই, আমীরের তরফ থেকে আমাদের পশ্চাদ্ধাবনের চেষ্টা বোধ হয় হবে না। পাইকটা সাঁতরে সাঁতরে কূলে গিয়ে উঠবে, তারপরে যাবে আমীরের কাছে খবর পেশ করবার জন্য। আমীরের মূলাকাৎ হঠাৎ না মিলতে পারে, তিনি হয়ত হারেম থেকে বেরুবেন সেই বিকেলবেলা। তারপর তোড়জোড় করে আমাদের পিছনে ধাওয়া করা, ততক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই নাগালের বাইরে চলে যাব।

তবে ঐ নাগালের-বাইরে-যাওয়া ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভাববার আছে কিছু। বাইরে যাওয়ার দরকার যতই থাকুক, খোলা সমুদ্রে এই নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়া মোটেই নিরাপদ হবে না। নৌকোটা অবশ্য বড়-সড়ই আছে, কিন্তু আমি আর জুরী তু'জনে মিলে ওকে ঠিকমত চালাতে পারব কেন? পাল আছে বটে, কিন্তু তা খাটানোব ব্যাপারে জুরী কোন সাহায্যই করতে পারবে না। দাঁড় বাওয়াও বেশীক্ষণ সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। ছেলেমানুষ ত! এ-যাবৎ ওর কাজ ছিল শুধু হাল ধরে বসে থাকা, আর জাল টেনে তোলার সময়ে একটুখানি হাত লাগানো। ঐ রকম হালকা কাজই ও পারে।

একে নৌকো চালাবার লোক নেই, তায় আবার ঝড়ের মুখে পড়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কাও রয়েছে। ঝড় যখন হয় এদিকে, প্রচণ্ড ভাবেই ত হয়! ইস্তাম্বুলকে কোথা থেকে ঠেলে কোথায় নিয়ে এল ঐ ঝড়, সর্বনাশ করে ছাড়ল একেবারে। ঝড়ের মুখে না পড়ে গেলে সে-জাহাজ ত ভূমধ্যসাগরেই ঢুকে পড়ত, আফ্রিকার উপকূলে এসে জলদস্যুর গ্রাসে পড়ে যেত না! ওঃ, ক্যাপ্টেন

উইলিয়ামস আর মেট রোজার্সের মৃত্যুর দৃশ্য আমি এখনও যেন দেখতে পাই চোখের সামনে।

আরও এক কথা ভাবতে হবে, খোলা সমুদ্রে বেশী দিন ঘোরার কোন উপায়ই নেই আমাদের। খাওয়ার জল পাব কোথায়? ছোট এক কলসী জল সঙ্গে আছে অবশ্য, তা দুইজন লোকের পিপাসা কয়দিন মিটবে সেইটুকু জলের সাহায্যে? কী রোদ্দুর যে ওঠে দুপুর নাগাদ, আর মুহুর্মুহু কী দারুণ পিপাসা যে পায় তখন, তা ত এই ছয় মাস ধরে দেখছি!

নাঃ, যেদিক দিয়েই বিচার করা যাক, খোলা সমুদ্রে বেরিয়ে পড়া যুক্তিযুক্ত হবে না আমার পক্ষে। কূল ঘেঁষে দক্ষিণমুখো যাওয়াই উচিত। দক্ষিণমুখো, কারণ ওদিকে আমীবের এলাকা বেশীদূর বিস্তৃত নয়। সে-এলাকার বাইরে যেতে পারলে দরকার-মত কূলে উঠতেও পারব আমরা। ওঠার প্রয়োজন ত হবেই জলের জন্য!

জুরী ছেলেটা ওরই মধ্যে বেশ সাহসী আর বুদ্ধিমান। পরামর্শ করার অন্য লোক নেই যখন, ওকেই জিজ্ঞাসা করলাম—কোন্‌দিকে আমাদের যাওয়া উচিত। ও সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিকে আঙ্গুল দেখাল।

"কেন? ওদিকে কেন?"—প্রশ্ন করলাম আবার।

দেশী ভাষাতেই কথা বলছে ও। এই ছয় মাসে ও-ভাষা আমি একটু একটু বুঝতে ও বলতে শিখেছি, কাজেই কথাবার্তা চালানো খুব শক্ত হল না।

ও বলল—ওদিকের বাসিন্দারা ঠাণ্ডা মানুষ শুনেছি। লড়াই-টড়াই করে না, মানুষের মাংসও খায় না। আর সেইজন্যই তোমাদের দেশের জাহাজ দুই একখানা মাঝে মাঝে না কি আসে ওখানে। আসে অবশ্যি ঐ বাসিন্দাদের ধরে নিজের দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তুমি ত তেমন জাহাজ পেলে বেঁচেই যাবে।"

এ একটা নতুন খবর, এবং ভাল খবর। সুতরাং নৌকো দক্ষিণেই চালালাম। কূলের খুব কাছ দিয়ে যে যাচ্ছি, তা নয়, তবে কূলকে চোখের আড়াল হতে দিচ্ছি না। মেঘ দেখলেই জোরে জোরে দাঁড় টেনে ডাঙায় গিয়ে উঠব। তা ছাড়া জলের কলসী খালি হলে কূলে ত উঠতে হবেই।

মাঝে মাঝে কূলের উপর বাসিন্দাদের দেখতে পাই। দলে দলে দাঁড়িয়ে নৌকোটা পর্যবেক্ষণ করছে। ঘোর কালো গায়ের রং, মাথার চুল কোঁকড়া, নারী পুরুষ সবাইয়েরই নিরাবরণ দেহ। জুরী যা বলেছে, সেকথাই ঠিক বলে মনে হল। এরা লোক নিরীহ। দুই একবার জল আনতে গিয়ে ওদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়েও গিয়েছে। আমাদের কোন অনিষ্টের চেষ্টাই ওরা করে নি। বরং জল কোথায় পাওয়া যাবে—জানতে চাইলে নিজেরাই কলসী নিয়ে জল এনে দিয়েছে। এদের সঙ্গে কথা অবশ্য জুরীই বলে। দেশী ভাষায় বিদ্যে আমার এমন বেশী নয় যে এসব লোকের জবান বুঝতে পারব, বা আমার মনের ভাব ওদের বোঝাতে পারব।

কোন জাহাজ এদিকে দেখা গিয়েছে কিনা ইদানীং, জুরীকে একদিন জিজ্ঞাসা করতে বললাম এদের কাছে। আশ্চর্য! প্রশ্নটা শোনা মাত্র হাউমাউ করে কেঁদে উঠল লোকগুলো। কেউ কেউ বুক চাপড়াতে বা মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করল। অনেকক্ষণ পরে শান্ত হয়ে ওরা জানাল—জাহাজ একখানা এক চাঁদ আগেই এসেছিল, তাদের গাঁয়ের আদ্ধেক লোককেই ধরে নিয়ে গিয়েছে। এই যে পঞ্চাশ ষাটটা লোক এখন রয়েছে গাঁয়ে, এরা রয়েছে শুধু এই কারণে যে সময় থাকতে গভীর জঙ্গলে এরা পালাতে পেরেছিল।

আমি জুরীকে বললাম—"জিজ্ঞাসা কর যে শুধু ধরেই নিয়ে গিয়েছে, না মেরেও ফেলেছে কিছু লোককে।"

আঙ্গুল তুলে গ্রামবাসী একজন দেখাল—তিন জন মারা পড়েছে ওদের হাতে। তারা বল্লম ছুঁড়ে মেরেছিল বসে। সে-বল্লমে

সাদাদের কেউ জখমও হয় নি। কিন্তু ওরা যখন আগুন ছুড়ে মারল—সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সাইকুরি, মুবকাটু আর বেল-ভুলি। একটা বড় গাছ ওরা দেখিয়ে দিল—তারই মাথায় লটকানো রয়েছে সেই তিনটি মৃতদেহ। অপঘাত মৃত্যু যাদের হয়, তাদের দেহের গতি ঐভাবেই করে এরা।

"তুমিও ত সাদা, আগুন তুমিও ছুড়তে পার নিশ্চয় ?"—একজন সরাসরি জিজ্ঞাসা করল এইবার। জুরী দোভাষী না থাকলে অবশ্য আমি সে প্রশ্ন বুঝতে পারতাম না। বুঝলাম যখন, আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এরা কি শেষে আমার উপরে ঝাল ঝাড়বে না কি ? করে যদি ত অবাক্ হওয়ার কিছু নেই। মিষ্টি হেসে বললাম—

"আমিও পারি অবশ্য ছুড়তে, তবে তোমরা জল এনে দিয়েছ যখন, তোমাদের কোন অনিষ্ট আমি করব না। আর দেখছ ত, আমি জাহাজ নিয়ে আসি নি, এনেছি একটা নৌকা মাত্র। তাতে একটা মাত্র কালো মানুষই ধরতে পারে, তা একটা কালা ত আছেই আমার !"

আর আলাপ জমাবার চেষ্টা না করে আমি তড়িঘড়ি নৌকায় গিয়ে উঠলাম। এর পর থেকে কূলে মানুষ দেখলে আর নৌকা ভেড়াবার চেষ্টা করি নি কোন দিন। খুব সম্প্রতিই, এক চাঁদ অর্থাৎ দিন পনেরো মাত্র আগে একখানা দাসব্যবসায়ী জাহাজ এ-অঞ্চলে চরম হানাদারি করে গিয়েছে। যারা বাধা দিয়েছে, তাদের হত্যা করেছে। যারা দেয়নি বাধা, তাদের বেঁধে নিয়ে গিয়েছে ইউরোপে আমেরিকায় দাসবৃত্তি করবার জন্য। স্বভাবতঃ নিরীহ এরা, কিন্তু কোন গ্রামে কেউ যে মরিয়া লোক নেই একটাও, এটা জোর করে বলা যায় কেমন করে ? কেউ যদি সাদা জাতের উপর প্রতিহিংসা নেবার জন্য আমাকেই আক্রমণ করে বসে, আমার ত আত্মরক্ষা করার শক্তিই নেই !

যা বলছিলাম, কূলে ওঠার উৎসাহ আমার একদম কমে গেল ঐ

ঘটনার পর থেকে। ডাঙ্গায় যেখানে নিবিড় বন, মানুষ জনের চিহ্ন যেখানে মোটেই দেখা যাচ্ছে না, তেমনি এক একটা জায়গায় দুই দিন তিন দিন পরে পরে এক একবার নৌকা ভেড়াই, চটপট জল ভরে নিই কলসীতে, পরিচিত পাকা ফল কোন গাছে দেখলে পেড়ে নিই তাড়াতাড়ি। আবার নৌকায় ফিরে গিয়ে কূল থেকে নিরাপদ দূরত্বে নোঙ্গর ফেলি।

আর সারাদিন সারাক্ষণ আমাদের দুই জোড়া চোখ অনবরত সমুদ্রের দিকে নিবদ্ধ থাকে, ঠাহর করবার চেষ্টা করে, কোনদিকে জাহাজের পাল চোখে পড়ে কিনা। দাসব্যবসায়ীদের জাহাজ যে আনাগোনা করে এ-অঞ্চলে, তা ত নিশ্চিতভাবেই জানা গিয়েছে। এই ত অতি সম্প্রতি এসে গেল একখানা। আমি কি তেমন কোন জাহাজের নাগাল পাব না? পেলেই ত আমার সকল বিপদ কাটে! কৃষ্ণাঙ্গদের উপরে তারা যতই অমানুষিক ব্যবহার করুক, আমি খাঁটী ইংরেজ, আমার সঙ্গে ভদ্রতা না করে তারা পারবে কেন? আর আমারই খাতিরে জুরীকেও ঘাঁটাতে সংকোচ হবে তাদের। জুরী চালাক ছেলে, নিজে থেকেই প্রস্তাব করে রেখেছে যে জাহাজে উঠেই সে নিজের পরিচয় দেবে—আমার, অর্থাৎ এই রবিনসন ক্রুসোর ক্রীতদাস বলে। কেমন করে কোথায় কবে তাকে ক্রয় করেছি আমি, সে-সব প্রশ্ন উঠলে তার জবাব দেবার ভার অবশ্য সে আমার উপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত আছে। অত-বড় লম্বা গল্প বানাবার মত কল্পনাশক্তি তার নিজের নেই।

কিন্তু কই? জাহাজ ত পাওয়াই যাচ্ছে না একটাও! আমরা দিনের দিন হতাশ হয়ে পড়ছি।

এমন সময় নবীন উৎসাহে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল আমাদের মুষড়ে-পড়া মন। একদিন সকাল বেলাতেই দূর সমুদ্রে পাল দেখতে পেলাম আমরা। আমাদের গতিপথ হল দক্ষিণমুখী। এ-জাহাজ চলেছে উত্তর পশ্চিমে। অন্ততঃ দুই মাইল দূরে কোনাকুনি এই পাড়ি যে

কোন্ গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে, তা আন্দাজ করবার কোন উপায় আমার নেই। থাকত উপায়, এ-সমুদ্রের একটা ম্যাপ আমার নৌকায় থাকলে। তা কাফ্রি কেল্লাদারের মাছধরা ডিঙ্গায় ম্যাপ আসবে কোথা থেকে ?

যাক, বিস্তীর্ণ পৃথিবীর যে কোন দেশেই যাক ঐ জাহাজ, আমাদের তুলে নিয়ে গেলে যে বাঁচি! জাহাজ যখন, নিশ্চয় কোন সভ্য জাতিরই জাহাজ। আশ্রয় তাদের কাছে পাবও। এবং আমার ঈপ্সিত কোন দেশে আমায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা তারা করবেও। এখন জরুরী কাজ হল ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

জুরীর গায়ে কোন জামার বালাই নেই, একখানা কটিবাস তার সম্বল। আমার গায়ে সেই ইস্তাম্বুলের আমলের জামা কাপড়ই আছে এখনো, যদিও অত্যন্ত জীর্ণ দশা তাদের। তা হোক জীর্ণ, বর্তমান মুহূর্তে কাজ দেবে। আমি গায়ের কোট খুলে ফেললাম ত্বরিতহস্তে, আর একখানা দাঁড়ের উপরে সেটাকে চাপিয়ে উঁচু করে নাড়তে লাগলাম। পাল নামানো ছিল রাত্রিবেলায়, জুরীর হাতে কোটসুদ্ধ দাঁড় গছিয়ে দিয়ে সেই পাল খাটাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমি। বুকের ভিতর এমন ঢিপঢিপ করছিল আমার! কোন রকমেই যদি এ জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারি, সে হবে আমার ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনের চরমতম দুর্ভাগ্য। এটা ফসকে গেলে আবার কত দিনে আর একখানা জাহাজ চোখে পড়বে, চোখে পড়বার আগেই আমরা অগাধ জলে তলিয়ে যাব কিনা অথবা কালো আফ্রিকার কোন নরঘাতক জাতির উদরস্থ হব কিনা, তার ঠিক কী!

কোট নাড়ছি, পাল তুলছি, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণে চিল্লাচ্ছি। জুরীর গলার জোর দেখলাম সাংঘাতিক। বিউগিলকে হার মানায়। সে-তারস্বর যে দুই মাইল দূরবর্তী জাহাজেও পৌঁছোবার শক্তি রাখে, এমন উন্মাদ আশাও আমার মনে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছিল বই কি!

কিন্তু চিৎকারে হোক বা কোট নাচিয়ে বা পাল উঁচিয়ে হোক,

যে ভাবেই হোক, জাহাজের নজর আমরা আকর্ষণ করলাম বইকি শেষ পর্যন্ত। পালটা সংকেত একটা জাহাজ থেকেও পাওয়া গেল। চিৎকারও নয়, কোটও নয়। বন্দুকের আওয়াজ একটা। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমি জুরীকে আলিঙ্গন করে বসলাম একেবারে। সে তখন আরও উঁচু পর্দায় চিল্লাচ্ছে। দাঁড়ের উপর কোট আরও প্রচণ্ড ভাবে উল্লম্ফন করে যাচ্ছে তার হাতে।

নৌকা আছে আমাদের, তবু ওরাও একখানা ডিঙ্গি নামাল। চারজন নাবিক সবল হস্তে দাঁড় টেনে কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে পৌঁছে গেল আমাদের কাছে। শ্বেতাঙ্গ নাবিক এরা, সাদা চামড়া দেখেই চোখ জুড়িয়ে গেল আমার। তাদের নেতা হয়ে এসেছিলেন এক মেট। সাগ্রহে করমর্দন করলাম তাঁর ও তাঁর সহচরদের।

সবাই তাঁরা উঠলেন এসে আমাদের নৌকায়, কারণ তাঁদের ডিঙ্গির চেয়ে অন্ততঃ তিন গুণ বড় এটা। সকলে মিলে দাঁড় টেনে জাহাজে পৌঁছে গেলাম দেখতে দেখতে। জাহাজের নাম "এমেবাল্ডা", কাপ্তেন ডন আলফন্জো। পোর্তুগীজ।

দাসব্যবসায়ী। জোর করে নিগ্রোদের ধরে নিয়ে আসে তাদের দেশ থেকে, বাধা পেলে নরহত্যা করতেও পেছ-পা হয় না। স্বভাবতঃ দয়ামায়াবর্জিত না হলে কেউ এমন সব কাজ করতে পারে না।

এরা তাই। এদের কাছে কি সদয় ব্যবহার পাব? আমার ত মনে বিলক্ষণ সন্দেহ জাগছে তখন।

যে নাবিকেরা আগু বাড়িয়ে গিয়েছিল, তারা অবশ্য ভাল ব্যবহারই করেছে এতক্ষণ। তবু, ওদের কর্তা, অর্থাৎ কাপ্তেনের সঙ্গে যতক্ষণ দেখা না হচ্ছে, আলাপ না হচ্ছে, ততক্ষণ বুঝতে পারা যাচ্ছে না যে কী ভাগ্যে আছে আমাদের।

হয়ত ভদ্র ব্যবহার পেতে পারি, এমন আশা আমার ছিল। কিন্তু যে-ব্যবহার কার্যক্ষেত্রে পেলাম, আমি কেন, অতি বড় আশাবাদীরও

কল্পনায় তা স্থান পেতে পারে না কখনও। কাপ্তেন আলফন্‌জো আমাকে গ্রহণ করলেন যেন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত। "আরে, আপনি ইস্তাম্বুল জাহাজের থার্ড মেট ছিলেন? মাত্র ছয় মাস আগে? তা হলে ত আমার সমব্যবসায়ী সহকর্মী বললেই হয়! তার উপরে আমার বাড়ি পর্তুগাল, আপনার বাড়ি ইংলণ্ড। ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। এ-দরজা ও-দরজা। আসুন, আসুন, সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিন। দুঃখকষ্ট যা পেয়েছেন, ভুলে যান একেবারে। নতুন পোশাক পরুন স্নান করে। খানা খান তৃপ্তি করে। ভগবান অনেক কষ্ট দিয়েছেন আপনাকে, তা দিন। পাপক্ষয় হয়ে গিয়েছে আপনার, এবারে আরাম করুন।"

এই সেই লোক, যে নিগ্রো পল্লীগুলোকে উজাড় করেছে কয়েক দিন আগে পর্যন্ত। কতক লোককে গুলি করে মেরেছে, কতককে আবার এই মুহূর্তে ফেলে রেখেছে এই জাহাজেরই খোলের ভিতরে শিকল দিয়ে বেঁধে। মানুষ সত্যিই বহুরূপী। জুরীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই উল্লসিত হয়ে উঠলেন—"আপনার দাস? দিব্যি হাসিমুখ দেখছি ত! তেমনি নধর দেহ। খুব ভাল হল। ওকে দিয়ে কিছু উপদেশ দেওয়াবেন আমার ঐ বজ্জাত কালা আদমি গুলোকে? বললে বিশ্বাস করবেন না—জাহাজে উঠে অবধি ক্রমাগত কাঁদছে, সে কান্নার আর বিরাম নেই। আমি ওদের ভালোর জন্যই নিয়ে যাচ্ছি, এটা ওদের মগজে ঢোকাতে পারছিনে আদৌ। কী নাম ওর? জুরী? দেখ ত বাপু জুরী, তুমি ওদের বোঝাও ত একটু! বোঝাও যে সাদা জাতের লোকের সংস্পর্শে আসতে পারাটাই কালোদের পক্ষে মস্ত জোর বরাতের কথা। নিজের উদাহরণ দিয়ে বোঝাও। বনে জঙ্গলে নিজের লোকের মধ্যে যত দিন ছিলে, খেতে পাও নি, পরতে পাও নি, এখন দেদার খাচ্ছ, দেদার পরছ। হ্যাঁ, তোমারও নতুন পোশাক দিচ্ছি এক স্যুট। পরে নাও, খাওয়া দাওয়া করে নাও। তারপর যাও, খোলের ভিতর নেমে বোঝাও ঐ আহাম্মকদের।"

কাপ্তেনের মুখে শুনলাম—ওর গন্তব্যস্থল বহুদূর। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল দেশ। গোটা আটলান্টিক মহাসমুদ্রটাই পাড়ি দিতে হবে এমেরাল্ডা জাহাজকে। তা উনি ভয় পান না তাতে। আগেও কয়েকবার দিয়েছেন। গিনি উপকূল থেকে নিগ্রোদের ধরে নিয়ে ব্রাজিলের আবাদে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবসাই তিনি করছেন গত কয়েক বছর।

এই প্রথম শুনলাম সেই দেশটির নাম, যেখানে আমি ছয় মাস দাস্যবৃত্তি করেছি এক বর্বর আমীরের। গিনি দেশ! ছেলেবেলায় কি ভূগোলে পড়েছিলাম এ-নামটা? মনে করতে পারলাম না।

হ্যাঁ। কাপ্তেন আলফন্‌জোর কাজই হল ঐ। ব্রাজিলের আবাদে আবাদে নিগ্রো দাস যোগান দেওয়া। মবলগ লাভের ব্যবসা।

প্রধানতঃ আলাপচারিটার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কিসের আবাদ হয় ব্রাজিলে? কারা করেন আবাদ?"

"কিসের আবাদ? এক নম্বর ধরুন তামাক, তুই নম্বর তুলো। বড় নদীর কাছাকাছি যে হাজার হাজার বর্গমাইল জমি পতিত রয়েছে, তাতে তামাক যা জন্মায়, তুনিয়ার সেরা তামাক মশাই। ইউরোপের বাজারে তার চাহিদা অসম্ভব। আর কী জিজ্ঞাসা করছিলেন? কারা করেন আবাদ? ইউরোপ থেকে যে আসে, সেই করে। হেন দেশ নেই ইউরোপের, যেখান থেকে কোন লোকই আসে নি ওরিনোকোর ধারে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য। ফেঁপে গিয়েছে মশাই! ফেঁপে গিয়েছে একদম। আপনি করবেন? জমি মৌফতে, যত পারেন, ঘিরে নিন। কেউ আপত্তি করবে না। আবাদ হোক, তামাক বিক্রি হোক, তখন ব্রাজিল সরকারের লোক আসবে একটা খাজনা-পত্রের ব্যবস্থা করতে। নামমাত্র খাজনা রে ভাই, নাম মাত্র। নেহাত এই জাহাজখানার মায়ায় বাঁধা পড়েছি, তাই সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরি এমন। তা নইলে দশ বিশ হাজার একর

জমিতে তামাক বসিয়ে দিয়ে আমি ইন্‌কাদের* মতই বড় মানুষ হতে পারতাম এতদিন।"

প্রায় দুই মাস লাগল আটলান্টিক পার হতে। কোথায় আফ্রিকা আর কোথায় আমেরিকা। ইউরোপের যে-কোন দেশে গিয়ে উঠতে পারলেই আমি খুশী হতাম, কিন্তু তা হবার কোন উপায় ছিল না। এক জাহাজ ক্রীতদাস নিয়ে কাপ্তেন ডন আলফন্‌জো নিজের পথ ছেড়ে অন্য দিকে যাবেন কী করে? সে-প্রত্যাশা বা সে-অনুরোধ কোন বিবেচক লোক করতে পারে না। এমনিই কাপ্তেন আমার বা জুরীর জাহাজ ভাড়া নেবেন না, বলে দিয়েছেন! আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে ভাড়া বাবদ আমার নৌকাখানা তিনি গ্রহণ করুন। তাতে তিনি হেসে বলেছিলেন—"নৌকাটি যদি আপনি দেন, আমি তা নেব। কারণ আমার একটা বড় নৌকা দরকার আছে, আর আপনার নৌকাটা সুশ্রী না হলেও টেকসই হবে বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, নৌকা আমি নেব, তবে দাম দিয়ে। হেসে-খেলে দু'শো পাউণ্ড দাম আপনি যে কোন বন্দরে পেতে পারেন ও-নৌকার জন্য, আমিও তাই দেব।"

এ-প্রস্তাব আমার পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। পয়সাকড়ি বলতে আমার ত কিছুই নেই। অথচ যে-কোন কাজ কারবার শুরু করতে হলে মূলধন চাই। তা এই দু'শো পাউণ্ড মূলধন নিয়ে আমি যে এবার অনায়াসে যা হোক কিছু-একটা ব্যবসা গড়ে তুলতে পারব, এমন আশা করা অন্যায় নয়।

কী-ব্যবসা করা যায়, তার পরামর্শ কাপ্তেনের কাছেই চাইলাম, কারণ লোকটির সদয়, অমায়িক ব্যবহার আমায় আকৃষ্ট করেছে। কাপ্তেন বললেন—"ব্যবসা করেন যদি, ওরিনোকোর কূলে তামাকের আবাদ করুন। আগেই ত বলেছি—বিনা পয়সায় জমি। যত চান তত জমি। সে-জমিতে সোনা ফলে, হাতে কলমে দেখতে পাবেন।"

* পেরু দেশের প্রাচীন রাজবংশ।

আমি রাজী হয়ে গেলাম। ইংলণ্ডে যাওয়া? বাবা বলেছিলেন সমুদ্রে গেলে আমার দুর্দশার সীমা থাকবে না। বস্তুতঃ এমেরাল্‌ডায় স্থান পাওয়ার আগে দুর্দশার সীমা ছিলও না আমার। এখনই বা কী? কাপ্তেন আলফন্‌জোর আশ্রিত মুখাপেক্ষী আমি। এ-অবস্থায় দেশে ফিরে গিয়ে বাবার সমুখে দাঁড়াতে আমার দারুণ লজ্জা করবে।

দেশে ফেরা? ফিরব, যদি কোনদিন লক্ষ পাউণ্ড পকেটে নিয়ে বাবার সমুখে দাঁড়াতে পারি। যদি তাঁকে দেখাতে পারি যে সমুদ্রে গেলেই মানুষ গোল্লায় যায় না।

তা লক্ষ পাউণ্ডকে ঠিক আকাশকুসুমের মত অবাস্তব মনে হচ্ছে না আমার। দেরি অবশ্য হবে। হয়ত বয়সটা বিশ থেকে বাড়তে বাড়তে পঞ্চাশ বা ষাটের কোঠায় পৌঁছে যাবে তখন। হয়ত ইংলণ্ডে ফিরে তখন আর বাবাকে জীবিত দেখতে পাব না। কিন্তু সে-আশঙ্কায় কাতর হলে চলবে কেন? মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। জেদ বজায় রাখবার জন্য লোক মরণও পণ করে এক এক সময়। আমি সুদীর্ঘ প্রবাসের ভয়ে মুষড়ে পড়ব?

আলফন্‌জোর পরামর্শই আমি গ্রহণ করলাম। ওরিনোকোর মোহানায় ছোট বন্দর, তারও নাম ওরিনোকোই। সেইখানে জাহাজ ভিড়ল আমাকে নামিয়ে দেওয়ার জন্য। একা আমাকেই। কারণ জুরী কাপ্তেনের সঙ্গে যেতে চাইছে দেশটা দেখে আসবার জন্য। তা সে ত সত্যি সত্যি আমার দাস নয়! ওর স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা আমি দেব কেন? যাক, তারপর আবার কোনদিন যদি আমার কাছে ফিরে আসতে চায়, আমার দরজা খোলাই পাবে। কাপ্তেন আলফন্‌জো ত এই পথেই যাতায়াত করেন প্রতিবার!

উনি যাবেন ব্রেজিলের অনেক অভ্যন্তরে, এই ওরিনোকো নদীরই উজান বেয়ে। সেখানে নদীর দুই কূলে বৃহৎ বৃহৎ আবাদ, প্রধানতঃ তুলোর। ওঁর জাহাজের খোলে বন্দী রয়েছে যেসব দাস, তাদের পৌঁছে দেবেন সেই সব আবাদেই। মালিকেরা দাদন দিয়ে রেখেছে

ওঁকে দাসের জন্য। কেউ বিশ জন নেবে, কেউ পঞ্চাশ। আবাদ যদি বড় করতে হয়, দাসের সংখ্যাও বাড়াতে হবে। স্থানীয় লোক ত দুর্লভ! যারা আছে, তারা মজুর খাটবে কেন? নিজেরাই আবাদ করবে। জমির ত দাম নেই! ঘিরে নিলেই হল। ঘিরবার কাঠেরও নেই দাম। জঙ্গল থেকে কেটে আনলেই হল। গোটা দেশটারই ত আদ্ধেক জঙ্গল, আদ্ধেক মাঠ।

কাপ্তেন এখানে জাহাজ ভিড়িয়েছেন শুধু আমাকেই নামিয়ে দেওয়ার জন্য। শুধু নামিয়ে দেওয়া নয়। ছোট ছোট দুই চারজন চাষী কাছাকাছিই আছেন, তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য। যাতে জমি সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁরা আমায় সাহায্য করেন। ওসব চাষী কাপ্তেনের চেনা, দুই একজন দাস এঁরা কেনেন কখনো কখনো, কিংবা ভবিষ্যতে কেনার আশা রাখেন।

কাপ্তেন একদিন বিদায় নিয়ে গেলেন, জুরীও গেল। আমি আবার নির্বান্ধব বৃহৎ পৃথিবীর এক অচেনা অংশে। তা নির্বান্ধব জীবনযাপন এখন আমার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। আমি নিজের কাজে লেগে গেলাম। কাপ্তেন নৌকার দাম দু'শো পাউণ্ড দিয়ে গিয়েছিলেন। তাই দিয়ে যন্ত্রপাতি, কোদাল কুড়াল লাঙ্গল ঘোড়া সব কিছু কিনে নিলাম। পঞ্চাশ একরের মত জমি পছন্দ করলাম এক জায়গায়, অন্য কেউ দাবিদার এখনো জোটে নি সে-জমির। মুশকিল হল—আমি নিছক একা। গাছ কেটে এনে তা থেকে গোঁজ এবং বাটাম তৈরি করা এবং সেই গোঁজ মাটিতে বসিয়ে সেই বাটাম পেরেক দিয়ে গোঁজের সাথে এঁটে দেওয়া, এ কি আর একজনের কাজ?

তবে সাহায্য জুটে গেল। আমার মত একা ত সব চাষীই! সহকারীর অভাব প্রত্যেকেরই হয় কখনো-না-কখনো। সেই অভাব দূর করার জন্য চাষীরা দল বাঁধেন প্রয়োজনের সময়। আশপাশের আট দশ জন প্রতিবেশী চাষী দলবদ্ধ হয়ে আজ একজনের, কাল অন্য জনের জমিতে কাজ করেন। তার ফলে শ্রমসাধ্য কাজও পড়ে

থাকে না কারও। আমারও রইল না। প্রতিবেশীদের সাহায্যে আমার জমি ঘেরা হল, ঘরও একখানা তৈরী হল। এইবার আমাকে পালটা বেগার খাটতে হবে বন্ধুদের আবাদে। সে-পর্ব শেষ হলে নিজের জমিতে লাঙ্গল নামাতে পারব। লাঙ্গল নামাবার বিদ্যে অবশ্য ঐ বন্ধুদের কাছ থেকেই শিখে নিতে হল।

কাপ্তেন আলফন্‌জো যখন ফিরে এলেন খালি জাহাজ নিয়ে, তখন আমি তুই একর জমিতে তামাক বসিয়ে ফেলেছি। এইবার যদি জুরী এসে যোগ দেয় আমার সাথে, আরও পাঁচ ছয় একর আমি আগামী মরসুমের আগেই চাষের উপযোগী করে ফেলতে পারব। সেই আশাতেই আমি কাপ্তেনের প্রত্যাবর্তনের আশায় পথ চেয়ে বসেছিলাম।

কিন্তু সে-আশায় নিরাশ হতে হল। জুরী সভ্য জীবনের স্বাদ পেয়েছে। দাস হিসেবে নয়, স্বাধীন শ্রমিক হিসেবে সে চাকরি নিয়েছে শহর-ঘেঁষা এক বড় আবাদে। হপ্তায় একদিন করে শহরে যায় সে এখন, দেদার ফুর্তি ওড়ায় রোজগারের পয়সায়। কাপ্তেনের মুখে খবরটা পেয়ে আমি বড় তুঃখেও হাসলাম খানিকটা। ঐ জুরী একদিন বলেছিল ও সারা জীবনে আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

কাপ্তেন আবারও গিনি যাবেন দাস যোগাড়ের জন্য। কিন্তু তার আগে নিজের দেশে যাবেন একবার, পোর্টুগালে। ভালই হল। এই সুযোগে আমি তাঁর হাতে একখানা চিঠি দিলাম আমার চির-হিতৈষিণী মিসেস রেনল্ডের নামে। তাঁর কাছে আমার কিছু অর্থ জমা আছে। তারই ভিতর একশো পাউণ্ডের মত খরচ করে কতক-গুলি অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র আমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম তাঁকে। তিনি যদি কাপ্তেন আলফন্‌জোর পোর্তুগালের ঠিকানায় জিনিসগুলি পাঠান, আলফন্‌জো সে-সব আমায় পৌছে দেবেন যথাসময়ে। বছর খানিকের মধ্যেই ত তিনি আবার এদিকে আসছেন দাসের চালান নিয়ে!

চার

বছর দুই কেটে গিয়েছে তারপর। কাপ্তেন আলফন্‌জো এসেছেন এবং গিয়েছেন তিনবার অন্তত:। বহু দাস এনে দিয়েছেন ব্রেজিলের বিভিন্ন আবাদে, বহু স্বর্ণমুদ্রা পাচার করে দিয়েছেন পোর্তুগালে নিজের বাড়িতে। আমার সঙ্গে তাঁর বান্ধবতার বন্ধন শিথিল হয় নি এ-যাবৎ। হবে বলে আশঙ্কাও করি না। কারণ আমারও এখন আর তাঁর কাছে কোন প্রত্যাশা নেই, তাঁরও নেই আমার কাছে। এক সময়ে তিনি অজস্র উপকার করেছেন আমার, আজীবন তা স্মরণ করব যথোচিত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

তাঁর মারফত মিসেস রেনল্ডের পাঠানো জিনিসগুলি আমি পেয়েছি। তাঁর পাঠানোর ঢের দিন পরেই পেয়েছি অবশ্য, কিন্তু তার আর উপায় কী ছিল? আলফন্‌জো সে-সব মাল নিয়ে আফ্রিকায় গিয়েছিলেন, তার পরে আটলান্টিক পেরিয়ে এসেছেন আমাদের দেশে। দেরি ত হবেই!

জুরীর আর সংবাদ পাই নি। আশা করি সে কুশলে আছে। এক সময়ে সে ছিল জীবন মরণের সহচর, আজ কোন সংস্রবই নেই তাতে আমাতে। সংসারের রীতিই এই। এখন আমার যা কিছু মেলামেশা সহমর্মিতা, তা নিকটবর্তী ক্ষুদে আবাদগুলির মালিকদের সঙ্গে। একই কাজের কাজী তাঁরা ও আমি। পরস্পরের ভিতর সহযোগিতা আছে, রেষারেষি নেই, যদিও একই ফসল উৎপাদন করে একই বাজারে আমরা সবাই পাঠাই। সে-ফসল হল এক এবং অদ্বিতীয় তামাক। উৎপাদন সামান্যই আমাদের, কারণ, আবাদগুলিই ত অতি ক্ষুদ্র। যত তামাকই আমরা তুলি, তা ইউরোপের

বাজারে চালান দিলেই বিক্রি। ঘরে বসে দাম পেয়ে যাব। আবাদ থেকে মাল নিয়ে যায় কারবারীরা, তারাই পাঠায় সমুদ্র পারে, আমাদের কোন ঝক্কিই নেই।

আমাদের সকলেরই এক দুঃখ, বেশী চাষ করার মত জনবল নেই। মজুর এদেশে নেই। দাস আনাবার মত অর্থও আমাদের নেই। আমাদেরই আবাদের সমুখ দিয়ে আমারই বন্ধু আলফন্‌জো বছরে একবার অন্ততঃ দাসবোঝাই জাহাজ নিয়ে চলে যান ওরিনোকোর উজানে বড় বড় আবাদের চাহিদা মেটাতে, অথচ তা থেকে একটা আধটা দাসও আমাদের পাওয়ার উপায় নেই। পেতে হলে আগে চুক্তি করতে হয় আলফন্‌জোর সঙ্গে, দাদন দিতে হয় মোটারকম। সে অর্থ আমাদের কোথায়? আমরা যে-কয়জন চাষী এখানে আছি, সবাই গরিব। একটা শক্তপোক্ত অল্পবয়সী দাস আলফন্‌জোর কাছে কিনতে গেলে পাঁচশোটা মোহর চাই অন্ততঃ। আমার নিজের কথা আমি বলতে পারি, বছর পাঁচেক না গেলে অত অর্থ আমার হাতে জমবার কোন সম্ভাবনা নেই। প্রথম বৎসরের ফসল থেকে আমার লাভ হয়েছে সোত্তর পাউণ্ড। এ-বছর আরও কিছু বেশী হতে পারে। কারণ গত বছরের হাঁসিল-করা জমির উপরে আবও কিছু নতুন জমি এবার আমি চাষের উপযোগী করে তুলতে পেরেছিলাম, ফলে ফসল কিছু বেশী পেয়েছি।

এই যখন অবস্থা, সেই সময় একটা ব্যাপার ঘটল। প্রতিবেশী কয়েকজন চাষী বন্ধু এক সন্ধ্যায় বেড়াতে এলেন আমার আবাদে। এমন যাওয়া-আসার রেওয়াজ আমাদের ভিতর নেই, সময়েরই অভাব। দেখা-সাক্ষাৎ যা হয়, তা কারও আবাদে দল বেঁধে খাটবার দরকার হলেই হয়। সাধারণের স্বার্থ নিয়ে আলোচনা যা-কিছু হওয়ার, তখনই হয় তা।

ঐ যে বলছিলাম, এভাবে দল বেঁধে কোন প্রতিবেশীর বাড়িতে আমরা কখনো যাই না। আজ তাই অবাক্ ত হলামই তাঁদের



আমি পায়ের নীচে অনুভব করলাম শক্ত পাথর [পৃঃ ৫৭

দেখে, আনন্দিতও হলাম বইকি! সব মানুষের অন্তরেই যে একটি চিরন্তন আড্ডাবাজ সত্তা সযত্নে নিজেকে লুকিয়ে রাখে সব সময়, সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল আমার ভিতর, আমার মুখে হাসি ফুটিয়ে আমায় ঠেলে বার করে দিল অন্য আড্ডাবাজদের সাদরে অভ্যর্থনা করে ঘরে এনে বসাবার জন্য।

ঘর আমার একখানাই। ছাদ ছাড়া সবই কাঠের তৈরি। ছাদটা অবশ্য ঢেউ-টিনের। সে-ছাদের নীচেও কাঠের পাটাতন। তা না দিলে শীতের সময় ঘর হয় অসহ্য ঠাণ্ডা, গরমের সময় অসহ্য গরম। তা ছাড়া দেয়াল কাঠের, মেজে কাঠের, দরজা জানলা ত কাঠের বটেই, সিঁড়িও কাঠের।

একখানা ঘরই দুই ভাগে ভাগ করা। ভিতর অংশ আমার শয়নকক্ষ, বাহির অংশে উঠি বসি, কখনো-সখনো একটু-আধটু পড়াশুনাও করি। আসন-সংখ্যা দুটি মাত্র এখানে। একখানার বেশী ত দরকারই হয় না কিনা!

ঘোড়া দুটোর আস্তাবল এবং তামাকের গুদাম, এর জন্য আমার ঘরেরই পিছন দিকে একটা লম্বা চালা লাগানো আছে।

যা হোক, আসন নেই বলে আটকালো না কিছু। কাঠের মেজে ত! তাইতেই আমরা সবাই পা মুড়ে বসে গেলাম গোল হয়ে। পেণ্টুলানে টান পড়তে লাগল অবশ্য। তা আর করা যাচ্ছে কী! কিছু রম্ সব আবাদীর ঘরেই মজুদ থাকে, আমারও ছিল। গোটা দুই বোতল আমি এনে ফেললাম। তবে গেলাস মোটে দুটো। মগ, বাটি, যেখানে যা ছিল, সবই এসময়ে বেশ কাজ দিল পানপাত্র হিসাবে। গলাটা বিধিমতে ভিজিয়ে নেবার পরে মঁসিয়ার এনরিকো কথা শুরু করলেন। জাত্যংশে ইনি ফরাসী, আমাদের এই গোষ্ঠীর ভিতরে উনিই এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশীদিন আছেন, হাঁসিল-করা জমির পরিমাণও তাই এঁর অন্যদের চাইতে

বেশী। তাই এঁকে খাটতে হয় উদয়াস্ত, এবং সে-খাটুনি এখন আর উনি তেমন সহ্য করে উঠতে পারছেন না। যৌবন পেরিয়ে এসেছেন কিনা!

এনরিকো বলছেন—“আর ত পারা যাচ্ছে না, বন্ধু কুরশোয়া!”

ক্রুসোকে উনি কুরশোয়া করে নিয়েছেন। কোন্ ব্যাকরণের কোন্ সূত্র-অনুযায়ী, তা অবশ্য জানি না।

কী যে পারা যাচ্ছে না, তা আদৌ না জেনেও আমি চটপট ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। সে-ঘাড় নাড়ার অর্থ অবশ্য এই যে পারা আর সত্যিই যাচ্ছে না।

“ভূতের মত খেটেও বছরে একশো পাউণ্ডের বেশী ঘরে তুলতে পারি না। অথচ জমির অভাব নেই, বীজ শস্যের অভাব নেই, ঘোড়ার অভাব নেই। অভাব কেবল—”

সমস্বরে জার্মান ফন এলস্‌বার্গ, ইতালীয় আলবার্টো, গ্রীক স্টিফানোজ পাদপূরণ করল এনরিকোর অসমাপ্ত ভাষণের—“অভাব কেবল মজুরের।”

আমার অজ্ঞানান্ধ চক্ষু ধীরে ধীরে উন্মীলিত হচ্ছে এতক্ষণে। আলোচনা কোন্ দিকে মোড় ঘুরবে এবার, তারই একটু আঁচ পাচ্ছি যেন।

এনরিকোই বললেন—“হ্যাঁ, একমাত্র অভাব হল মজুরের। খাটবার লোক নেই। দাস না হলে আবাদ হয় না। অথচ দাস কিনবার পয়সা আমাদের নেই।”

আমি একটু রহস্য না করে পারলাম না—“কথা সবই অত্যন্ত ঠিক। তা দাস যোগাড় করা এমন শক্ত কী? এবার যখন এমেরাল্‌ডা জাহাজ এই নদী দিয়ে উজিয়ে যাবে, চলুন আমরা দল বেঁধে হানা দিই তার উপর, যার যত দরকার কেড়ে নিয়ে আসি আলফন্‌জোর কাছ থেকে।”

একটা অট্টহাস্য। কাঠের ঘর সরগরম কয়েক মিনিটের জন্য।

তার পরে আমি ঠাণ্ডা হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কী ঠাউরেছেন, সেইটা বলুন এবার।"

এনরিকো খুলেই বললেন—

দাস দরকার। অন্ততঃ গোটা পাঁচেক দাস সঙ্গে থাকলে প্রত্যেকটি চাষী নিজের রোজগার দশগুণ বাড়িয়ে ফেলতে পারেন। অথচ একটা দাস কিনবার সামর্থ্যও কারও নেই। তা কিনবার সামর্থ্য যখন নেই, তখন অন্য উপায়ে যোগাড় করতে হবে। যে-উপায়ে যোগাড় করেন আলফন্‌জো, সেই উপায়েই। অর্থাৎ আফ্রিকা থেকে জোর করে ধরে এনে।

আমার চক্ষু একটু একটু করে উন্মীলিত হচ্ছিল এতক্ষণ, এইবারে একেবারে বিস্ফারিত হয়ে গেল এক নিমেষে। আফ্রিকা থেকে ধরে আনা? এঁদের উৎসাহ দেখছি অভ্রভেদী!

এনরিকো বলে যাচ্ছেন—"একখানা ছোট জাহাজ ভাড়া নেব। কাপ্তেন এবং নাবিক মোতায়েন করব তাতে। প্রয়োজনীয় রসদ তাতে তুলব। হিসাব করে দেখেছি—হাজার পাউণ্ডে কুলিয়ে যায় সব! ওটা চাঁদা করে তুলতে হবে আমাদের মধ্যে থেকেই। জনা সাতেক আমরা আছি, মাথা পিছু দেড়শো পাউণ্ড চাঁদা দিলেই যথেষ্ট হবে। আমরা সবাই পারব তা দিতে। আপনিও অবশ্যই পারবেন ইচ্ছে করলে।"

"তা হয়ত পারব"—স্বীকার করলাম আমি—"কিন্তু বিশ্বাসী এবং ওয়াকিবহাল কাপ্তেন পাবেন কোথায়? আমরা অভিযান পাঠালাম, কিন্তু শো-খানিক দাস জাহাজে তোলার পরে সে হয়ত ব্রাজিলে না এসে মেক্সিকোতে চলে গেল, বা ইউরোপের কোন দেশে। যেখানেই যাক, দাসের বাজার সর্বত্রই আছে। নিখরচায় পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পকেটে উঠল তার। সে আর এমুখোই হল না। তার পরে আমরা কী করব?"

"তার পর নয়"—বললেন এনরিকো—"যা করবার, তা আগেই

করব। কাপ্তেনের উপরে নির্ভর করব, এমন গবেট আমরা নই। কাপ্তেন নেব জাহাজ চালাবার জন্য। অভিযানের নেতৃত্ব করবেন আপনি—"

"আমি ?"—আমার বিস্ফারিত চক্ষু এবার ছুটে বেরুতে উদ্যত।

"হ্যাঁ, আপনি। কারণ গিনি উপকূল আপনি চেনেন। সেই খানেই কাপ্তেন আলফন্‌জোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনার। যাবেন, দাস পাকড়াবেন, জাহাজ ভরতি করে নিয়ে চলে আসবেন। এখানে এসে পৌঁছোবার পরে দাসগুলিকে সমান ভাবে ভাগ করে নেব আমরা। অসুবিধা কী ? দেড়শো পাউণ্ড খরচা করে প্রত্যেকে পাঁচ সাত বা দশটা দাসের মালিক হয়ে বসতে পারব আমরা। তখন আর কি ! দুই চার হাজার একর জমি হাঁসিল করে নিন জনে জনে, তামাকে তামাকে ডুবিয়ে দিন পৃথিবীর বাজার। লক্ষ পাউণ্ডের মালিক হয়ে যান দশ পনেরো বছরের ভিতরে।"

লক্ষ পাউণ্ড ! ঐটিই দরকার আমারও, ইংলণ্ডে ফিরে মাথা উঁচু করে বাবার সামনে দাঁড়াতে হলে।

ভাগ্য দেবী চিরদিন সমান বিরূপ আমার উপরে। সুখে থাকা আমার বরদাস্ত হয় না। পিতৃগৃহের নিরাপদ এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ আশ্রয় আমার মনঃপূত হয় নি। আমি মাতাপিতার ব্যাকুল নিষেধ সত্ত্বেও ছুটে বেরিয়েছি বৃহৎ পৃথিবীর মজা লুটবার জন্য। মজা পেয়েছিও যথেষ্ট—বোম্বেটের হাতে বন্দী হয়ে এবং তারপরে বর্বর এক নিগ্রো সর্দারের বান্দাগিরি করে।

তারপর কাপ্তেন আলফন্‌জোর কৃপায় উদ্ধার পেয়ে একটা আবাদের মালিক হয়ে বসেছি। ঠাণ্ডা মাথায় কয়েক বৎসর এখানে কাজ করে যাই যদি, সম্পন্ন কৃষক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে না-পারার কোন কারণই নেই। এমন একটা স্থিতিশীল অবস্থা আমার বরাতে বেশীদিন টিকতে পারে কি ? প্রতিকূল নিয়তি এবার কুমন্ত্রণা দিল মসিয়ার এনরিকোর জবানি—"যাও গিনিতে, দাস নিয়ে

এসো এক জাহাজ, বড় মানুষ হয়ে যাও রাতারাতি।" আমি টোপ গিলে ফেললাম। রাজী হয়ে গেলাম এনরিকোর প্রস্তাবে।

একটা প্রশ্ন কেবল তুললাম আমি—"আমি চলে গেলে আমার এই আবাদের কী হবে? যতই ছোট হোক, একটা সম্পত্তি ত! সেটাকে নষ্ট হতে দিই কোন্ প্রাণে?"

বন্ধুরা একবাক্যে বললেন—আবাদ আমার নষ্ট হবে না। তাঁরাই দেবেন না নষ্ট হতে। তাঁরাই চাষ করবেন, কেনা বেচা করবেন, হিসাব রাখবেন, এবং আমি ফিরে এলে সব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দেবেন আমাকে। আমি যে তাঁদেরই অনুরোধে সমূহ কষ্ট স্বীকার করতে যাচ্ছি, এইভাবে তার যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদান দেবেন তাঁরা।

আর আমার আপত্তির কারণ রইল না। দুঃসাধ্যকে সাধ্যের ভিতরে আনবার জন্য রক্ত আমার চনমন করে উঠেছে শিরায় শিরায়। আর্থার ও শার্লামেনের* নাইটদের মত আমিও যেন মহৎ কর্তব্যের আহ্বান পেয়েছি একটা। জীবন পণ করে সে-কর্তব্য সাধন না করলে যেন মনুষ্যত্বেরই গ্লানি হবে আমার।

নির্বোধ, হঠকারী এবং সবচেয়ে বড় কথা, দুর্ভাগা এই রবিনসন ক্রুসো। বন্ধুরা আমার আবাদের ভার নিতে রাজী হয়ে দস্তুরমত লেখাপড়া করে দিচ্ছে, এতেই সে স্বর্গ হাতে পেয়ে গেল। বিপদ? ব্যর্থতা? মৃত্যু? ওসব কথা ভাবতে গেলে বীর হওয়া যায় না। আমিও ভাবলাম না।

আলফন্‌জো মাস দুই বাদেই আসছেন আবার। তার আগেই আমাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়া চাই। তিনি হয়ত এ-প্রচেষ্টার কথা শুনলে খুশী হবেন না। হয়ত বিঘ্ন ঘটাবার দিকেই ঝোঁক হবে তাঁর। এই সব ভেবে তাঁর কাছ থেকে ব্যাপারটা গোপন করে যাওয়াই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করলাম। একবারও ভাবলাম না যে

* আর্থার ইংলণ্ডের রাজা এবং শার্লামেন ফ্রান্সের রাজা ও প্রায় সমগ্র মধ্য ইওরোপের সম্রাট ছিলেন।

আলফন্‌জো আমার একান্ত হিতৈষী। কোন কারণেই অসৎ পরামর্শ তিনি দেবেন না আমায়।

এনরিকো করিৎকর্মা লোক। সব তোড়জোড় করে ফেললেন তু'দিনেই। জাহাজ ভাড়া করে আনা হল, কাপ্তেন খুঁজে আনা হল, নাম তাঁর পিক্রুজ, আলফন্‌জোর মত ইনিও পোর্তুগীজ। পিক্রুজই নাবিক নিয়োগ করলেন বারোজন, ছোট জাহাজ, বেশী নাবিকের দরকার ত নেই। জাহাজ আমাদের ছোটই নিতে হয়েছে, কারণ বেশী ভাড়া দেবার অর্থ আমাদের কই ?

পাচক, ভৃত্য প্রভৃতি আরও তিন চার জন লোক অবশ্যই সঙ্গে চলল আমাদের।

অবশেষে একদিন বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে জাহাজে চড়ে বসলাম। যতদিন গিনি-উপকূলে না পৌছোবে জাহাজ, ততদিন আমার করণীয় কিছু নেই। জাহাজ চালাবেন পিক্রুজ, আমি কেবিনে শুয়ে আরাম করব।

দক্ষ কাপ্তেন এই পিক্রুজ। তুই মাসের ভিতর আটলান্টিক পেরিয়ে আমরা আফ্রিকার উপকূলে পৌছোব, তাঁর কাছে এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। জাহাজ ব্রেজিল সাগর পেরিয়ে খাস আটলান্টিকের ভিতরে এসে পড়ল। আর সেই সময়ই একদিন উঠল তুমুল ঝড়।

ঝড়! ঝড়! ঝড়! আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রার দিন থেকে ঐ ঝড়ই বার বার বিপদে ফেলেছে আমাকে। স্টিভের বাবার জাহাজে উঠে যেদিন হাল থেকে লণ্ডন যাত্রা করেছিলাম, সেই দিনই বিরূপ ভাগ্য আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিল ঐ ঝড়। তারই ফলে সী-নিম্ফ হল বিপন্ন, বিপর্যস্ত। তারই ফলে স্টিভের বাবা আমায় চাকরি দিতে অস্বীকার করলেন। তা না হলে হয়ত উপকূল বাণিজ্যের জাহাজে তুই এক বছর কাজ করে আমি শেষ পর্যন্ত বাড়িতেই ফিরে যেতাম।

যা হোক, স্টিভের বাবা প্রত্যাখ্যান করলেন বলেই আমি অন্য চাকরি খুঁজতে বাধ্য হলাম। কাপ্তেন উইলিয়ামসের চাকরিতে ঢুকলাম হিতৈষী বন্ধু রেনল্ডের মৃত্যুর পরে, তা সেখানেও ঐ ঝড়। ঐ ঝড়ই আমাকে নিয়ে ফেলল জলদস্যুর খপ্পরে। নামিয়ে দিল একেবারে ক্রীতদাসেব পর্যায়ে।

তা থেকে উদ্ধার পেলাম আলফনজোর কৃপায়। আবাদের কাজে সবে দু'পয়সাব মুখ দেখতে শুরু করেছি, এমন সময়ে ভাগ্য আমাকে আবার ঠেলে পাঠিয়ে দিল সমুদ্রে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার জাহাজেব অবস্থা সঙ্গিন হয়ে দাঁড়াল টাইফুন-ঝটিকার তাণ্ডবে।

আগের দুইবারের ঝড় যেন ভাগ্যদেবতার সতর্কবাণী। অল্প অল্প দুর্ঘটনা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপদ তারা চাপিয়েছিল আমাব মাথায়। সামান্য কিছুদিন কষ্ট ভোগ করেই তা থেকে রেহাই পেয়েছি। নিয়তি যেন দেখতে চাইছিলেন যে দেয়ালের লিখন আমি পড়তে পারি কিনা। তা যখন পারলাম না, তখন আর তিনি দয়া করার প্রয়োজন বুঝলেন না। সরাসরি ঠেলে দিলেন জীবন-ভোর যন্ত্রণার মুখে।

সেই কথাই বলব অতঃপর।

ব্রেজিল সাগরেব এলাকা পেরিয়ে এসেছি। মহাসাগরের বুকে পাল তুলে দিয়ে মাত্র দিন তিনেকের পথ এগিয়েছি পূব দিকে। এমন সময়ে এল ঝড়। মহাঝটিকা টাইফুন! দক্ষিণ দিক থেকে এসে আমাদের ডান দিকের পাঁজরে দিল ধাক্কা। ডুবতে ডুবতে খাড়া হয়ে উঠল জাহাজ। কাপ্তেন তখনই জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন উত্তর পানে। ঝড়ে পড়লে বাঁচবার একমাত্র উপায় হল ঝড়কে পিঠের দিকে রেখে তার আগে আগে এগিয়ে যাওয়া। মুখোমুখি বা পাশা-পাশি ধাক্কা দেবার সুযোগ কদাচ দিতে নেই ঝড়কে। দিলেই অতলে নেমে যেতে হবে।

গতিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার ফলে আপাততঃ জাহাজ বাঁচানো গেল বটে, কিন্তু আর একদিক দিয়ে মহা সংকটে পড়ে গেলাম আমরা!

যাব পূব-দক্ষিণে, অথচ যাচ্ছি খাড়া উত্তরে। কোথায় গিয়ে পড়ব শেষ পর্যন্ত, তা ভবিতব্যই জানেন।

দিনের পরে রাত্রি আসে, রাত্রির পরে দিন, জাহাজ ছুটেই চলেছে অন্ধবেগে। চারদিনের দিন কাপ্তেন খবর দিলেন—তলায় ছিদ্র হয়েছে জাহাজের। জল উঠছে গলগল করে। অচিরে ডাঙা না পেলে জাহাজ ডুববেই।

আমি নির্বাক্ হয়ে গেলাম। আর একবার বাবার সেই অলক্ষুণে কথা মনে পড়ল আজ—"তুই বেঘোরে প্রাণ হারাবি।"

তখন খোলে পাম্প চলছে ক্রমাগত। ঝড় বন্ধ হয়েছে, কাজেই উপরে আর বেশী লোক থাকার দরকার নেই। সবাই খোলের ভিতর নেমে গিয়েছে জল ছেঁচবার জন্য। ওরই উপর ত জীবন নির্ভর করছে কিনা এই আঠারোটা লোকের! নাবিক বারোজন, কাপ্তেন আর আমি, এই চোদ্দজন আমরা। তাছাড়া পাচক ভৃত্য চারজন।

মাস্তুলের উপরে একখানা মাচা থাকে সব জাহাজেই, তার নাম হল কাকের বাসা, ক্রোজ্-নেস্ট। সেখানে বসে একটা লোক পাহারা দেয় সারাক্ষণ, সমুদ্রের কোন দিকে কোন নতুন জিনিস দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দিয়ে কাপ্তেনকে জানায় সেকথা।

সেই কাকের বাসা থেকে হঠাৎ হাঁক শুনতে পেলাম—ডাঙ্গা! ডাঙ্গা! কাপ্তেন অমনি তড়বড় করে উঠে গেলেন কাকের বাসায়। গেলাম আমিও। আমার অবশ্য মাচার উপরে ঠাঁই হল না। সরু লোহার সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে কাপ্তেনের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কাপ্তেন তখন দূরবীন দিয়ে দেখছেন উত্তর-পূব কোণের দিকে কোন একটা অলক্ষ্য বস্তুকে। কতক্ষণ পরে আমার দিকে ফিরে বললেন—"ডাঙ্গা বলেই মনে হয়। হয়ত কোন ছোট দ্বীপ হতে পারে। ঐ দিকেই যাওয়ার চেষ্টা করা যাক। পৌঁছোতে যদি পারি, জাহাজের ফুটো মেরামতের চেষ্টা হতে পারবে। নইলে ত—"

নইলে যে কী, তা তিনি খুলে বললেন না। আমিও জানতে চাইলাম না—কী তাঁর মনের কথা।

ঝড় নেই, কিন্তু মেঘ বিলক্ষণ আছে আকাশে, কাজেই পাল তুলে দিতে সাহস করছেন না কাপ্তেন। পাম্প করবার জন্য চার জনকে নীচে রেখে বাকী সব নাবিককে তিনি উপরে নিয়ে এলেন দাঁড় টানবার জন্য। ডাঙ্গার দিকে ধীরে ধীরে এগুতে থাকল জাহাজ, একেবারে শম্বুক গতিতে।

অবশেষে সেই উদ্দিষ্ট ভূখণ্ডটুকুতে আমরা পৌঁছোলাম বহু কষ্টে। ভূখণ্ড নামের যোগ্য অবশ্য সেটা নয়। একটা বড়সড় চড়া ছাড়া আর কিছুই তাকে বলা যায় না। পুরো জোয়ারে জাহাজ উঠেই চলল সেই চড়ায়, যতক্ষণ তলায় মাটি না ঠেকল। এখন শুধু অপেক্ষা করা, কতক্ষণে ভাটির টানে জল সরে যাবে নীচে থেকে। তখন সুড়ঙ্গ খুঁড়ে মিস্ত্রীকে নেমে যেতে হবে খোলের নীচে। ফুটোর মুখে লোহার পাত বসাতে হবে নীচে থেকে। কঠিন কাজ! এবং সে কাজ শেষ করতে হবে ভাটির ছয় ঘণ্টার মধ্যে।

যা হোক, সে কঠিন কাজও আমরা সবাই মিলে সম্পন্ন করলাম বইকি, সেই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই। কাপ্তেন এবং আমি, আমরাও সানন্দে হাত লাগিয়েছিলাম সেই সুকৃত কর্মে। পরের জোয়ার যখন এল, জাহাজের তলা দিয়ে জল আর উঠছে না দেখা গেল। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

এবার আবার ভরা জোয়ারের জন্য প্রতীক্ষা করে বসে থাকা। ডাঙ্গায় চড়িয়ে দিয়েছি জাহাজ। জোয়ার ছাড়া নামবে কেন?

আসছে, ফুঁসতে ফুঁসতে বেড়ে উঠছে জোয়ার। চোখের সামনেই ফুলে ফুলে উঠছে দিগন্তবিসারী জলবিস্তার। আমি সেই দিকেই তাকিয়ে দেখছি, পিছন থেকে কাপ্তেন বললেন—"একবার উপর পানেও তাকান"—তাকাতে গিয়েই আমার চক্ষুস্থির। আকাশে আকাশ কই? এ যে শুধুই মেঘের উপরে মেঘ। যে-ঝড়

সবে আজ সকালে থেমেছে, সেটা শুরু হওয়ার আগেও আকাশের চেহারা এমনি নিকষ কালো ভয়ংকর হয়েছিল। তাহলে কি দ্বিতীয় কিস্তি ঝড় আর একটা উঠবে না কি? আমি ত্রস্তভাবে কাপ্তেনের মুখের দিকে তাকালাম।

"এখন সর্ব কর্ম ত্যাগ করে আগে জাহাজটা চড়া থেকে নামাই ত!" বলে কাপ্তেন ছুটলেন সেই কর্মটিতেই নাবিকদের নিয়োগ করবার জন্য। না কবলে ত সমূহ বিপদ! ঝড়ের সময় খোলা সমুদ্রই নিবাপদ। চড়ায় ধাক্কা লাগলে বা ঘষা খেলে জাহাজ বানচাল হওয়াব সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

জল অনেক বেড়ে গিয়েছে, অথচ ঝড় এখনও ওঠে নি। সুতরাং জাহাজকে নামানো কষ্টসাধ্য হল না। হাঁফ ছেড়ে নিয়ে কাপ্তেন এবার বললেন, "আমি দূরবীন দিয়ে সমুদ্রটা ভাল কবেই পর্যবেক্ষণ কবেছি। আটলান্টিকের কোন্ অংশে আমরা এসে পড়েছি, তা অবশ্য বুঝতে পারছি না। তবে যেখানে এসেছি, সেখানে দূরে দূরে দ্বীপ আছে অনেকগুলি।"

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম—"জাহাজের তলা যখন মেরামত কবে ফেলেছি আমরা, তখন আশা করা যাক যে সে-দ্বীপগুলির কোনটিতেই আমাদের উঠবাব দরকার হবে না। ওরিনোকো থেকে বেরিয়ে আমাদের যাওয়ার কথা ছিল আফ্রিকার গিনি উপকূলে। ঝড়ের তাড়নায় আমরা এসে পড়লাম উত্তর দিকে। সম্ভবতঃ এখানে বাঁয়ে উত্তর আমেরিকার মহাদেশ রয়েছে, ডাইনে কারিব সাগরের দ্বীপপুঞ্জ। কাজেই ডাইনে বাঁয়ে কোনদিকেই আমরা যাব না, ঘটনা-চক্রে বাধ্য না হলে।"

কাপ্তেন সায় দিলেন, "তা ত বটেই। দ্বীপে ওঠাব কথা আমি বলি নি। সমুদ্রটার বর্ণনা দিচ্ছিলাম শুধু।"

ঐ ঝড় এসে গেল আবার। সমুদ্র যেন জাহাজখানাকে দু'হাতে ধরে উপর পানে ছুড়ে দিল একটা ফুটবলের মত। তারপর সেটা

যখন পড়ল আবার, লুফে ত নিলই না খেলোয়াড়দের মত, বরং কোথায় ওটা পড়বে তা আন্দাজ করে নিয়ে দ্রুত সরে গেল সে জায়গা ছেড়ে। জাহাজ যখন নামল আকাশ থেকে, একটা গভীর গহ্বরের মধ্যেই নামল এসে, সে-গহ্বরের চার পাশে ফেনিল তরঙ্গমালার বন্ধুর প্রাচীর, মাথার উপরে বিদ্যুৎবিদীর্ণ কালো আকাশ।

চলল আবার জীবন মরণের দোটানা। সারা দিন, রাত্রিরও প্রায় অর্ধেক। দুপুর রাতে আমি কেবিনে গিয়ে শ্রান্ত দেহ শয্যায় এলিয়ে দিয়েছিলাম একবার, চোখ মুদেও এসেছিল গভীর অবসাদে। এমন সময়ে এমন একটা প্রচণ্ড দোলা লাগল জাহাজে যে, দোলনা-বিছানা থেকে আমার ছয় ফুট লম্বা দেহটা সবেগে নিক্ষিপ্ত হল কেবিনের মেজেতে। রীতিমত ব্যথা পেয়ে জেগে উঠলাম আমি।

জেগে উঠেই শুনতে পেলাম নাবিকেরা চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে। রীতিমত ভয়ার্ত কলরব। আচমকা ধাক্কা খেয়ে তারা এ-ওর ঘাড়ে উলটে পড়েছে, "এই বুঝি ডুবে গেলাম" এই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে ভীরুর মত।

কিন্তু ভীরু তারা নয়, কাপ্তেনের আদেশ কানে পৌঁছোনোমাত্র তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল এবং বর্তমানের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হল, ভয় বা উত্তেজনার কোন লক্ষণই প্রকাশ না করে।

সে কর্তব্য হল, বোট জলে নামানো। একখানি মাত্র বোট আমাদের, তবে সেটা বেশ বড় আকারের, আমাদের সবাইকেই ধরবে তাতে। কাপ্তেন বিপদের স্বরূপ গোপন করেন নি। এ-সাগরে চড়া আছে, দ্বীপ আছে, তেমনি আছে অসংখ্য চোরা পাহাড়ও। তেমনি এক চোরা পাহাড়ের মাথায় চড়ে বসেছে জাহাজ। সদ্য মেরামত-করা তলা ফেঁসে চৌচির হয়ে গিয়েছে। জল উঠছে ফোয়ারার মত।

চোরা-পাহাড়ের মাথায় চড়ে বসেছে জাহাজ, এক্ষুণি কিন্তু নেমে পড়তে পারে আর একটা তরঙ্গের ধাক্কায়। সুতরাং তাড়াতাড়ি এ-জাহাজ ছেড়ে বোটে আশ্রয় নেওয়া দরকার। অবশ্য এই উত্তাল

সমুদ্রে বোটও কতক্ষণ টিকবে, কিছু বলা যায় না। তবু যতক্ষণ যত ভাবে সম্ভব, আত্মরক্ষা করতে হবে ত!

কিছু খাবার, কিছু পানীয় জল, দুই একটা যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে আমরা বোটে নেমে গেলাম। দূরে সরিয়ে নিলাম বোট, যাতে বোটও না চুরমার হয়ে যায় চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে।

এইবার আমরা খোলা সমুদ্রে। ঢেউ! লাখে লাখে প্রমত্ত কুঞ্জর যেন তাণ্ডব নাচ নেচে চলেছে চারি ধারে। একটা সামলাতে আর একটা ঘাড়ে এসে পড়ে। জলে জলে টইটুম্বুর বোটের ভিতরটা। সবাই মিলে সেই জল ছেঁচে ফেলছি প্রাণপণে। যাতে ডুবে না যাই।

কিন্তু ডুবেই গেলাম শেষ পর্যন্ত। বোট তলিয়ে গেল না, উলটে গেল। আমরা আরোহীরা কে কোথায় গিয়ে পড়লাম, কে কার দিকে তাকায়! আমি নিজে কেমন হতজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম এক মুহূর্তের জন্য। যখন চৈতন্য ফিরে এল, অনুভব করলাম যে একটা ঐরাবত ঢেউ আমাকে কোথায় যেন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে দুর্বার বেগে।

পাঁচ

ঢেউ যতক্ষণ ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল আমায়, কোন্ দিকে যাচ্ছি তা ঠাউরে দেখবার কোন উপায় ছিল না। নোনা জলে নাকানি চোবানি খেতে খেতে চোখ কান মেলে থাকা ত আর সম্ভব নয়!

কিন্তু ঢেউয়ের বেগ এক সময়ে নিঃশেষ হয়ে এল, আমি পায়ের নীচে অনুভব করলাম শক্ত পাথর। তাকিয়ে দেখি, জল নেমে যাচ্ছে দ্রুতবেগে আমার পায়ের নীচে থেকে। আশেপাশে বড় বড় পাথরের চাঙড় মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে বালুকাময় বেলাভূমির উপরে। রাত তখন ভোর হয়ে এসেছে। ঊষার ধূসর আলোতে সে-বেলাভূমিকে মনে হল সুপরিসর এবং ক্রমোচ্চ।

পরিস্থিতিটা বুঝে নিলাম ভাল করে। একটা ঢেউ আমাকে এই পর্যন্ত পৌছে দিয়ে গিয়েছে। ভগবানের দয়া নিশ্চয়। ঢেউয়ের কাঁধে সওয়ার না হতে পারলে সমুদ্রগর্ভে সলিলশয্যা গ্রহণই হত আমার নিয়তি। যা হোক, একটা ঢেউ ফিরে গিয়েছে আমায় এইখানে নামিয়ে দিয়ে। আবারও ঢেউ আসবে হয়ত। আমি যদি তার কবলিত হই, ফিরে যাওয়ার সময়ে সে অবশ্যই আমায় গভীর সমুদ্রে টেনে নিয়ে যেতে চাইবে আবার। তা যদি সে পারে, আমার শক্তি হবে না পুনরায় উঠে আসার।

এ অবস্থায় আমার পক্ষে দরকার হল দৌড়ে গিয়ে এমন জায়গায় ওঠা, যেখানে পরবর্তী ঢেউ আর আমার নাগাল পাবে না, তা সে যত পরাক্রান্তই হোক। যেমন চিন্তা, তেমনি কাজ। দৌড় লাগালাম প্রাণপণে। দৌড়োচ্ছি, আর পিছন পানে জলোচ্ছ্বাস শুনছি উত্তাল এক তরঙ্গের। আওয়াজ শুনেই ওকে আড়ে-দীঘে পাহাড়প্রমাণ বলে বুঝতে পারছি। ওর খপ্পরে যদি পড়ি একবার—

পড়েই যেতে হল। আমার চাইতে ক্ষিপ্র গতি ঐ ঢেউয়ের। একেবারে কানের কাছে শুনছি ওর গর্জন, ছিটকে-আসা ফেনার চাপড়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে সারা পিঠ। এল! ধরল!

আর পালাবার সময় নেই। পায়ের কাছে নাতিবৃহৎ পাথরের চাঙ্গড় একখানা। আমি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম তারই উপরে, দুই হাত দিয়ে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলাম তাকেই। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল সেই ঢেউ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার পিঠে। অতিক্রম করে গেল আমার ভূলুণ্ঠিত দেহটাকে, আমার মনে হল একটা আস্ত পাহাড় চেপে বসেছে আমার পিঠের উপরে, তার ভারে বুক ফেটে এক্ষুণি বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে আমার।

তা আর গেল না শেষ পর্যন্ত। এ-ঢেউয়েরও শক্তি ফুরিয়ে এল, পিছন ফিরল সমুদ্রে ফিরে যাওয়ার জন্য। আমি পাথরের চাঙ্গড় আঁকড়ে ধরে পড়ে আছি, নইলে ওর পিছটানের বেগ আমাকে ছিঁড়ে নিয়ে যেত নিশ্চয়, নিক্ষেপ করত গভীর জলে।

ঢেউ ফিরে যাওয়া মাত্র আমি উঠে পড়লাম, দৌড় লাগালাম আবার, অবসন্ন দেহকে জোর করে তুলে নিয়ে। আবারও আসছে ঢেউ, টের পাচ্ছি। কিন্তু আর সে ধরতে পারছে না আমায়। আমি এখন এমন জায়গায় পৌঁছে গেছি, যেখানে বালি শুকনো। অর্থাৎ ঢেউ এখানে ওঠে না, উঠবে না। আমি তাহলে নিরাপদ। একটা পাথরের ধারে আমি শুয়ে পড়লাম হাফ ছাড়বার জন্য। পাথরের ধারে। যাতে—অসম্ভবকে সম্ভব করে দিয়ে পরের কোন ঢেউ এসেও পড়ে যদি এ পর্যন্ত আমি ঐ পাথর ধরে আত্মরক্ষা করতে পারি তার আক্রমণ থেকে।

কিন্তু আর ঢেউ এলো না। সমুদ্র যেন একটু একটু করে শান্ত হয়ে আসছে। আমি ধীরে ধীরে বেলাভূমির বাকী অংশটুকু পেরিয়ে গেলাম। একটা অনুচ্চ পাহাড় পেলাম প্রথমেই। খাড়া পাহাড় নয়, উঠতে কোন অসুবিধা নেই। হাঁপাতে হাঁপাতে আমি উঠে

পড়লাম তার উপরে, কারণ কীরকম জায়গায় এসে পড়েছি, সেটা দেখে নেওয়া সর্বাগ্রে দরকার।

আকাশে তখন মেঘ মাত্রও নেই, নবীন রোদে ঝলমল করছে আকাশ পৃথিবী সমুদ্রবক্ষ। ঢেউ অবশ্য এখনও উঠছে, আগের মত ক্রুদ্ধ গর্জন কিন্তু তার আর নেই এখন। রোরুদ্যমান শিশু ঘুমিয়ে পড়ার সময় তার বুকটা যেমন ফুলে ফুলে ওঠে আর দীর্ঘনিশ্বাস বেরোয় তা থেকে কাঁপতে কাঁপতে, সমুদ্রের বুক তেমনিই ফুলছে আর নিশ্বাস ফেলছে এখন।

ও কী? জাহাজখানা ত ডোবে নি!

চোরা পাহাড়ের মাথায় সে আটক পড়েছিল, বসে আছে ঠিক সেইখানেই। বসে আছে আগের চেয়ে আরামেই বরং। আমরা যখন নেমে এসেছিলাম ওর ডেক থেকে, তখন এমন কাত হয়ে পড়েছিল ও, আমরা যেন দাঁড়াতেই পারছিলাম না ওর উপরে। এখন কিন্তু তত কাত আর ও নেই। হয়ত উলটো দিক থেকে ঢেউয়ের ঘা এসেছিল খুব প্রচণ্ডবেগে, কাত জাহাজকে কতকটা সোজা করে দিয়ে গিয়েছে।

এঃ, এখন মনে হচ্ছে জাহাজ ছেড়ে না এলেই হত ভাল। জাহাজ টিকে আছে এখনও, টিকে নেই নৌকো। আর সেই নৌকায় যারা আশ্রয় নিয়েছিল? বারোটা নাবিক? কাপ্তেন পিক্রুজ? ভৃত্যেরা চারজন? তারাও কি বেঁচে নেই কেউ?

আমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ, একটা জীবিত প্রাণীকেও ভাসতে দেখলাম না কোনদিকে। ডাঙ্গার দিকে তাকালাম এইবার, অনেকটা দূরে একটা জিনিস বেলাভূমিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে, দেখলাম। বুঝতে দেরি হল না, ওটা আমাদের সেই নৌকো। সেই নৌকো, জীবনরক্ষার আশায় জাহাজ ছেড়ে যার আশ্রয় নিয়েছিলাম আমরা। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঘা খেতে খেতে উলটো ভাবেই ভাসতে ভাসতে ডাঙায় এসে উঠেছে।

কিন্তু তার আরোহীরা? উপকূলের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি সঞ্চালন করছি আমি, ভূতপূর্ব সাথী সতেরো জন মানুষের মধ্যে একটিকেও কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। বিশ্বাস করতে পারছি না নিজের চোখকেও। এও কি হতে পারে কখনও? একজনও ওঠেনি কূলে? একজনও না? অতগুলি শক্তসমর্থ সাঁতারুর মধ্যে একজনও সমুদ্রের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে পারল না?

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না। অবশ্যই উঠেছে। অন্ততঃ দু'জন একজনও উঠেছে নিশ্চয়। সবাইকেই ঠিক এই জায়গাটায় এসে উঠতে হবে, এমন বা কী কথা আছে? হয়ত দূরে দূরে কোন পাহাড়ের আড়ালে বা বেলাভূমির কোন নাবাল অংশে তারা উঠেছে, শ্রান্ত দেহে হয়ত বিশ্রাম নিচ্ছে, একটু পরেই তাদের দেখা পেয়ে যাব হয়ত। কত কী আশায় বুক বাঁধছি আমি। কেন বাঁধব না? এও কি হতে পারে? আঠারোটা মানুষের মধ্যে একা আমি বেঁচে যাব, এও কি হতে পারে? কোন্ বিশেষ পুণ্যে আমি বাঁচব? কোন্ সুকৃতির বলে?.

একটা কথা সেই তরুণ বয়সে জানা ছিল না আমার। সুকৃতির বল থাকলে মানুষ দীর্ঘজীবীই হয় যে, এমন কোন কথা নেই। কবিরা বলেন—দেবতারা যাকে ভালবাসেন, অল্পবয়সেই কোলে টেনে নেন তাকে। শত বৎসর পরমায়ুব অধিকারী তারাই হয়, যাদের ভাগ্যে অপরিসীম দুঃখ-যন্ত্রণা লিখে রেখেছেন বিধাতা পুরুষ।

সেদিন জানা ছিল না এ সত্য। পরে জেনেছি, যুগব্যাপী নিঃসঙ্গ নির্বাসনের জ্বালা তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে এ-সত্য মজ্জায় মজ্জায় ঢুকিয়ে দিয়েছে আমার ভিতরে। থাক সেকথা—

অনেকক্ষণ ধরে এদিক ওদিক সযত্নে পর্যবেক্ষণ করেও যখন আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় জীবিত প্রাণীর অস্তিত্বের কোন নিদর্শনই কোনদিকে দেখতে পেলাম না, তখন অগত্যা আমি নেমে এলাম পাহাড়েব মাথা থেকে। একেবারে নিছক নিঃসম্বল অবস্থায় কূলে

এসে উঠেছি। পরনের জামা জুতো-প্যাণ্ট ছাড়া আজ আর আমার কিছু নেই। এ দ্বীপে যদি মানুষ না থাকে, তবে আমি খাব কী? মানুষ থাকলেও যে তারা আমাকে খেতে দেবে, এমনই বা কী কথা আছে? খেতে না দিয়ে তারাই বরং খেয়ে ফেলতে পারে আমাকে। এমন সব অজানা দ্বীপে নরখাদক বুনোদের বসতিও থাকে কখনো কখনো।

দ্বীপ-দ্বীপ করছি বটে, কিন্তু আদৌ এ-স্থানটা দ্বীপই যে, তাই বা আমি কী করে জানছি? কাপ্তেন পিক্রুজ বলছিলেন বটে যে দূরবীন দিয়ে সমুদ্রের যে-চেহারা তিনি দেখেছেন, তাতে আটলান্টিকের এ অংশটাকে বহুদ্বীপে সমাকীর্ণ বলেই মনে হয়েছে তাঁর। তাই যদি হয়, সে দ্বীপপুঞ্জই বা কোন্ দ্বীপপুঞ্জ? অনাবিষ্কৃত, অর্ধাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের, দ্বীপ উপদ্বীপ মহাদ্বীপের সংখ্যা এই নতুন পৃথিবী আমেরিকায় এত বেশী যে আমি এখন ক্যারিব দ্বীপপুঞ্জের কোন একটাতে আছি, না বাহামার, না অন্য কোন নাম-না-জানা দেশের, তা বুঝবার আমার কোন উপায় নেই। সুতরাং এখানে মানুষ আছে কিনা, থাকলে বা কী ধরনের মানুষ আছে—কেমন করে জানব?

অর্থাৎ, সমুদ্রকে ফাঁকি দিয়েছি বটে, কিন্তু মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়েছি, এমন কথা জোর করে বলতে পারি না। যম হয়ত অন্য কোন আকারে আমার জন্য অদূরেই অপেক্ষা করছেন, পা বাড়ানো মাত্রই তাঁর মুখে গিয়ে পড়তে হবে।

অথচ পা ত বাড়াতেই হবে। কাল এমন সময়, জাহাজের চারদিকে তরঙ্গমালার আথালপাথাল আক্রমণের মধ্যে বসেও কাপ্তেনের সঙ্গে দিব্য উপাদেয় নানা খাদ্য দিয়ে প্রাতরাশ সমাধা করেছি। আজ খাওয়ার জন্য সমুখে দেখছি খামচা খামচা মাটি, আর পানীয়ের জন্য দেখছি মহাসাগরের কানায় কানায় ভরতি নোনা জল।

তা খেয়ে ত মানুষ বাঁচে না। সুতরাং সত্যিকার খাদ্য কিছু যোগাড় করা দরকার। পাহাড় থেকে নেমে পড়লাম সমুদ্রের উলটো দিকে। এদিকটা বনভূমি। প্রথম প্রথম তরুলতা বিরল, ক্রমে তারা নিবিড় থেকে নিবিড়তর। এইবার আশ্বস্ত হলাম। না, অনাহারে হয়ত হবে না মরতে। গাছে গাছে পাকা ফল, আঙ্গুর লতায় পাকা আঙ্গুর। পাখিতে খাচ্ছে দল বেঁধে, সুতরাং মানুষেরও অভক্ষ্য হবে না। স্বাদু না হতে পারে। আঙ্গুর ছাড়া কোনটাই পরিচিত নয় বিশেষ। দেখা যাক—

নাঃ, খারাপ ত নয়। একটা দুশ্চিন্তা দূর হল। ফোয়ারাও পেয়ে গেলাম একটা। একটু দূরে বটে, কিন্তু জল সুপেয়। আমার ত জলপাত্র বলতে করপুট। অঞ্জলি অঞ্জলি জল পান করে স্নানও করে ফেললাম ভাল করে। গায়ে নোনাজল শুকিয়ে নুনের আস্তর পড়ে গিয়েছিল একটা, তার চটচটানি থেকে রেহাই মিলল এইবার।

এই ফল-জল আবিষ্কারে এবং স্নানে ভোজনে বেলা কিন্তু গড়িয়ে গিয়েছে। বেলা কত? দু'টো হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু বনচ্ছায়ায় এরই মধ্যে আলো হয়ে এসেছে গোধূলিবেলার মত ম্লান। দ্বিতীয় দফা দুশ্চিন্তা আমার মাথায় বাসা বাঁধল এবার—রাত কাটাব কোথায়? এ জঙ্গলে হিংস্র শ্বাপদ অবশ্যই থাকতে পারে। মাটিতে রাত কাটাবার চেষ্টা করলে সে-রাত আর না কাটতে পারে আমার ভাগ্যে। একটা বড় গাছ দেখে তারই মাথায় উঠে বসি যদি—

ধারে কাছে সব গাছই ছোট। বাঘ যদি লাফ দেয়, হাতি যদি শুঁড় তোলে, অনায়াসে ধরে ফেলবে আমায়। বড় গাছ খুঁজে বার করবার জন্য একটু বেশী জঙ্গলে যেতে হল। পেয়ে গেলাম শেষ পর্যন্ত আমার পছন্দমাফিক এক বিশাল মহীরুহ। মাটি থেকে অনেক উপরে একটা সুপরিসর তেডালাও রয়েছে তার, ঐখানে ঐ গাছেরই পাতা পুরু করে বিছিয়ে রাত্রিতে ঘুম লাগানো যাবে।

অবশ্য তার আগে আর এক প্রস্থ খাওয়ার প্রয়োজন হবে।

আগের বারের খাওয়াটাকে যদি প্রাতরাশ মনে করি, এটা তা হলে হবে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন। আর সেটাকেই যদি দ্বিপ্রাহরিক ধরা যায়, এটাকে মনে করতে হবে সব ভোজের রাজা ডিনার। উপকরণ অবশ্য সেই একই, বনের ফল এবং ফোয়ারার জল। বেলাবেলি তাই দিয়ে উদর পূর্ণ করে নিলাম এবং তরুশাখার রাজশয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। জাহাজ থেকে নেমে নৌকায় ওঠার পর থেকে দেহের উপর দিয়ে ধকল গিয়েছে অস্বাভাবিক রকম, ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হল না। এবং সে ঘুম ভাঙ্গল পরের দিন সূর্যোদয়ের অনেক পরে। নিবিড় বনেও মাঝে মাঝে রোদ্দুরের প্রপাত এসে পড়েছে, আর সে রোদ্দুর দস্তুরমত প্রখর, তা দেখে বুঝতে পারলাম—বেলা এখন অন্ততঃ নয়টা।

আবার প্রাতরাশ, সেই একই ফলে জলে। তারপর আবিষ্কারের অভিযান। পাহাড়ের উপরে উঠলাম আর একবার। প্রধানতঃ জাহাজটার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য। ডোবে নি। যেভাবে ছিল কাল, আজও ঠিক সেইভাবেই আছে। থাকবেও হয়ত সেইভাবেই, যতদিন আর একটা ঝড় উঠে ওকে কাত করে বা উল্‌টে অগাধ জলে ফেলে না দেয়। সেটা যে-কোন দিনই হতে পারে। ঝড়ের সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী পৃথিবীর এ অংশে করা যায় না দেখেছি। এই যে টাইফুনটা আমাদের আফ্রিকাগামী জাহাজখানাকে উত্তর আমেরিকার অনাবিষ্কৃত সমুদ্রে এনে ফেলল এবং শেষকালে ঠুঁটো জগন্নাথ করে লটকে রেখে দিল চোরাপাহাড়ের মাথায়, এর সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী কি কাপ্তেন পিক্রুজ বা অন্য কেউ করতে পেরেছিলেন?

হ্যাঁ, যে কোন মুহূর্তে আর একটা ঝড় পারেই উঠতে। আর তা যেদিন উঠবে, ও জাহাজকে আর আমি দেখতে পাব না, চঞ্চল সমুদ্রের বুকে একমাত্র অচঞ্চল বিন্দুটি, ঐ ভাঙ্গা জাহাজ "মেরিয়ানা'কে। বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে আমি যে একাত্ম ছিলাম

এতদিন, তার একমাত্র স্মারক বস্তু এখন যেটি আছে, সেটি হারিয়ে যাবে সেদিন চিরতরে।

কিন্তু মনটাকে হতাশায় ডুবে যেতে দিলে ত চলবে না আমার! যদি বাঁচতে হয়, আমাকে অতিমাত্র তৎপর আর সতর্ক হতে হবে। যেখানে এসে পড়েছি, সেখানে তৈরী জিনিস কিছুই পাব না আমি। সভ্য জীবন যাপনের জন্য যা কিছু অপরিহার্য, সবই আমাকে যোগাড় করে নিতে হবে নিজের চেষ্টায়। খাদ্য? তৈরি করে নিতে হবে। পরিচ্ছদ? তৈরি করে নিতে হবে। আশ্রয়? তৈরি করে নিতে হবে। স্বাবলম্বন ছাড়া গতি নেই কিছু। চেষ্টা—চেষ্টা—চেষ্টা শুধু।

তবে হ্যাঁ। চেষ্টা করার জন্যও যেসব উপকরণ দরকার, তার কিছু কিছু রয়েছে ঐ মেরিয়ানা জাহাজে। রয়েছে এখনও। তবে বেশীদিন থাকবে না। জাহাজ ডুবে গেলেই সে-সবও গেল। নাগালের বাইরে গেল চিরদিনের জন্য। তার আগে যদি ওসব এনে ফেলা যায় জাহাজ থেকে?

যাবে না? যাবে না? ঐ নৌকোখানা—ভেসে এসে উলটে পড়ে আছে বালিতে মুখ গুঁজে। খাড়া করে ভাসানো যায় না জলে? তা যদি যায়, আর আমার দুঃখ কী? সমুদ্র এখন শান্ত। নৌকো বেয়ে চলে যাব জাহাজে, যা যা দরকার আমার, নিয়ে আসব নৌকোয় তুলে। জীবনযাত্রা তত বেশী দুর্বহ হবে না এই বিজন অরণ্যভূমিতেও।

এই চিন্তা মাথায় আসতেই আমি পাহাড় থেকে নেমে ছুটে গেলাম নৌকোর কাছে। ঠেলাঠেলি করলাম অনেক। কিন্তু বড় আশায় হতাশ হতে হল আমাকে। এক ইঞ্চিও নড়াতে পারলাম না সেই ঢাউস বোটকে। মেরিয়ানা জাহাজের আঠারোটা লোকের সব দিক দিয়ে সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে এই নৌকাটা উলটে গিয়ে। প্রথমতঃ মারা গিয়েছে সতেরো জন, বাকী আছে যে-অষ্টাদশ সংখ্যক

মনুষ্যটি, তারও বাঁচার পথের অন্তরায় ঐ নৌকোর উলটানো অবস্থা।

উপায় নেই! উপায় নেই! অন্ততঃ দশটা লোক দরকার ওকে সোজা করতে। কোন উপায় নেই।

একান্তই নৈরাশ্যপীড়িত একটা রবিনসন ক্রুসো উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেলাভূমিতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে তখন। বেশীক্ষণ চলবে না বেড়ানো, ক্ষিধে পেয়েছে, বনে ঢুকতে হবে ফল পাড়বার জন্য। অথচ ঐ ঐ যে জাহাজ মেরিয়ানা, সমুদ্রের বুকে রাজহংসটির মত চুপচাপ ভাসছে, ওর গর্ভে কী না আছে? রুটি আছে, মাখন আছে, পনির আছে। মাংস আছে, রম আছে, ব্রাণ্ডি আছে। দুঃখ এই যে সে-সব আমার ভোগে লাগবে না। পৃথিবীর শতকোটি ক্ষুৎপীড়িত মানুষ কারোই ভোগে লাগবে না। আজ হোক, দু'দিন বাদে হোক, অনিবার্যভাবেই অতলজলশায়ী হবে সমুদ্রগর্ভে। অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই মর্মান্তিক অপচয় নিঃশব্দে সহ্য করে যেতে হবে আমাকে। নিজের জঠর ক্ষুধায় যখন জ্বলে যাচ্ছে তখনও।

কিন্তু সত্যই কি আমি অতখানিই অসহায়? নৌকাখানা ভাসাতে পারছি না বটে, কিন্তু তা বলে কি ভেলাও তৈরি করতে পারব না একটা? মনে পড়ল বেলাভূমিতে তক্তা পড়ে থাকতে দেখেছি কয়েকখানা। কোনও ভাঙ্গা জাহাজের তক্তা হাজার হাজার মাইল জলে ভেসে ভেসে হয়ত অবশেষে বিশ্রামলাভ করেছে এসে এই বিজন দ্বীপের পাথর-ভরা সৈকতে। পাথর আছে বলেই আটকে গিয়েছে তাতে, ফিরতি-বেলায় কোন ঢেউ আর তাদের টেনে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি অগাধ জলে।

আমি দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম সেই তক্তাগুলির উদ্দেশে। প্রথম যখন দেখতে পেয়েছিলাম, কোন কাজে লাগবে বলে মনেই হয় নি। এখন কিন্তু মনে হচ্ছে ওরা এক তাল সোনার চাইতে বেশী দামী আমার কাছে। ঐ যে! আছে। পাশাপাশি দু'খানা

তক্তা, অন্ততঃ আট ফুট লম্বা। আমি সযত্নে বালি থেকে তুলে নিলাম তাদের। আছে, মজবুতই আছে এখনও। যায় নি পচে। তক্তা দু'খানা সমতল জায়গায় টেনে নিয়ে গেলাম। তারপর ছুটলাম বনের ভিতর।

বনে আমার দু'টো কাজ। গাছ থেকে ফল পেড়ে নিয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করা, অমনি ভেলা তৈরির উপকরণ সংগ্রহ করা। কী সে উপকরণ? কিছু ডালপালা আর শক্ত লতা। ডাল একেবারে সরু হলে চলবে না, আবার বেশী মোটা হলেও চলবে না। ঠিক ততখানি স্থূল হওয়া চাই, যতখানি হলে গায়ের জোরে গাছ থেকে ভেঙ্গে নামানো যায়। ততখানি স্থূল এবং যথাসম্ভব সোজাও!

ছয় টুকরো কাঠ আমি সংগ্রহ করলাম এমনি। তিন ফুটের মত লম্বা এক একটা। আর সংগ্রহ করলাম বন থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এক গাদা লতা। জাহাজের কাছির মত মোটা রাক্ষুসে লতাও আছে বইকি অরণ্যে। কিন্তু সেসব আমি নিলাম না। সেসব ছেঁড়াও যাবে না, আর তা দিয়ে গেরো দেওয়াও সম্ভব হবে না। অনতিস্থূল শক্ত লতাই নিলাম আমি এক রাশি। অনেক প্রত্যাশা নিয়েই আমি ছুটলাম সেখানে, যেখানে রেখে এসেছি সেই দু'খানা তক্তা। এইবার ভেলার সরঞ্জাম হাতে এসে গিয়েছে আমার।

তক্তা দু'খানা পাশাপাশি রেখে তার উপরে নীচে তিন থাক বসালাম গাছের ডাল। দুই প্রান্তে দু'টো, আর মাঝ-বরাবর একটা। ছয় টুকরো ডালই ছিল আমার, তাতেই হয়ে গেল কাজ। এইবার বাঁধন দেওয়া। ঐ লতা দিয়ে। প্রতি জোড়া ডালে তিনটি করে গেরো। দুই প্রান্তে দু'টো, দুই তক্তার মাঝের ফাঁকে একটা। লতা দিলাম প্রচুর, এক একটা গেরোতে। যাতে সহজে ছিঁড়ে না যেতে পারে।

ভেলার কাজ শেষ। এইবার ওকে জলে ভাসানো। তার জন্য উপযুক্ত জায়গা খোঁজা দরকার। বেলাভূমি যেখানে বেশ ঢালু হয়ে

জলে গিয়ে মিশেছে, এমনি একটা ঘাট আমার চাই। এ-যাবৎ যতটুকু অংশ আমি দেখেছি সৈকতের, তা পাথরের চাঙ্গড়ে চাঙ্গড়ে এমন আকীর্ণ যে তার ভিতর দিয়ে ভেলা নামানো সম্ভব হবে না। খুঁজতে হবে।

বেশ অনেকক্ষণই খুঁজতে হল বইকি! কিন্তু সে-পর্ব যখন শেষ হ'ল, আমার আনন্দ তখন দেখে কে! চমৎকার একটি ঘাট পেয়েছি।

এ-যাবৎ যা-কিছু আনাগোনা করেছি, ডাঙ্গায় ওঠার পরে, তা করেছি শুধু এই ভূখণ্ডের পশ্চিম উপকূলেরই বরাবর। এ-ঘাট পেলাম সেই পশ্চিম উপকূলেরই মাঝামাঝি এক জায়গায়। এখানে একটা সরু খাল সমুদ্র থেকে এসে ঢুকেছে ডাঙ্গার ভিতর। খালের মুখ অবশ্য দুই পাশেই অনুচ্চ পাহাড়ের প্রাচীরে দুরধিগম্য, কিন্তু খালের সামান্য উজানেই পাহাড়ের আর অস্তিত্ব নেই, অধিকন্তু বনসীমা থেকে মৃদুভাবে ঢালু হতে হতে একটা খোলা মাঠ একেবারে নেমেছে গিয়ে সেই খালের জলে।

খাল-খাল করছি বটে, কিন্তু এটা খাল কি নদী, তা বুঝতে পারছি না। এ-ভূখণ্ডটা যদি মহাদেশের একটা অংশ হয়, বৃহৎ আকারের দ্বীপও হয় একটা, তা হলে এই জলধারাটার পক্ষে নদীপদবাচ্য হওয়ারও বাধা নেই। কিন্তু আমার এই আশ্রয়স্থলটি যদি ক্ষুদ্র একটা দ্বীপ ছাড়া আর কিছু না হয়, তাহলে অবশ্যই এটা খাল, এবং খাল বলেই আমি এর উল্লেখ করব এখন থেকে।

সে যা হোক, এই খালেই আমি ভেলা ভাসাব স্থির করলাম। এখন দেখছি. খালের জলে ভাটির টান লেগেছে। বেলা এখন তিনটের মত হয় যদি, এর পরের ভাটি হবে শেষ রাত্রে। সেই ভাটিতে ভেলা খুলে দেব আমি। এই ভাটির টানেই জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারব আশা করি। এখন আজকের করণীয় মাত্র দু'টিই আছে আমার। ভেলা টেনে এখানে এনে মজুদ রাখা, আর

বন থেকে দাঁড়ের কাজ চালাবার মত দু'খানা হালকা ডাল ভেঙে আনা। তা হলেই কাল পুবদিক ফরসা হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জল-যাত্রা শুরু করতে পারব।

সে দু'টি কাজ অবশ্য তক্ষুণি সমাধা করে রাখলাম। কিন্তু পরদিন প্রত্যূষে বৃক্ষশাখার সুখশয্যা থেকে নেমে আসার পরে মনে পড়ে গেল তৃতীয় আর একটি কাজের কথা। সেটাও সমানই জরুরী। প্রাতরাশের জন্য প্রচুর পরিমাণে বনফল সংগ্রহ করে নেওয়া। জাহাজে কখন পৌঁছাব, কিছুই বলা যায় না। কত রকমই ত বিঘ্ন দেখা দিতে পারে জলপথে! দেরি হলেই ক্ষিধে পাবে। জাহাজের ভাঁড়ার যদি তখন নাগালের বাইরে থেকে যায়, খুবই মুশকিল হবে তা হলে। সুতরাং, পথের সম্বল থাকুক কিছু।

যা হোক, সব দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়ে অবশেষে আমি ভেলা ভাসিয়ে দিলাম খালের জলে। কী গেরো দেখ, ভেলা ভীষণ কাত হয়ে পড়ছে একদিকে। এমন কাত যে আমি দাঁড়াতে বা বসতে পারছি না ঠিক হয়ে। কী করা যায় এখন? দৌড়ে গিয়ে ওজনদার দেখে কয়েক চাঙড় পাথর নিয়ে এলাম কূল থেকে। উঁচু দিকে চাপিয়ে দিলাম তার দু'খানা। ব্যস, ভেলা সোজা হয়েই ভাসছে এবার।

আমি যখন গাছের ডালের দাঁড় দিয়ে জল টানতে শুরু করলাম, তখনও সূর্য ওঠে নি। প্রবল টান ভাটির। সেই স্রোতে ভেলা যেই পড়ল, তীরবেগে ছুটতে শুরু করল সাগর পানে। সামাল, সামাল! জলের ভিতর জোরে চেপে রেখেছি গাছের ডালখানি। সেই আমার হাল। সেটি যদি ভেঙে যায়, বা জলের ধাক্কায় উঠে পড়ে উপরে, ভেলা বোঁ করে ঘুরে যাবে লাট্টুর মত, হয়ত ভুচ করে ডুবে যাবে গোটা কতক পাক খেয়ে।

খাল ছেড়ে সমুদ্রে পড়েছি। স্রোতের ঠেল ক্রমশঃ মৃদু। তবু আমি চুপ করে আছি হাল ধরে। জাহাজ ঐ দেখা যায়। ঠিক

সমুখে নয় আমার, বেশ খানিকটা ডাইনে। আমায়ও ডাইনে ঘোরাতে হবে ভেলা। কিন্তু এখন নয়। আগে স্রোতের টান একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাক, জল স্থির হোক, তারপর।

সে-সময় এল যখন, এক বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়ল আমার। একটা মৃতদেহ—ভাসছে ঠিক আমার সামনে। নাবিকের উর্দী দেখে চিনলাম, এ আমাদের মেরিয়ানা জাহাজেরই নাবিক ছিল। মুখখানা দেখতে পেলাম না, লাশ উবুড় হয়ে ভাসছে। দেখতে পেলাম না, সে ভালই হল একরকম। রাত্রিবেলায় সে-মুখ আবার স্বপ্নে দেখা দেবে ত!

আমি ভেলার মুখ ডাইনে ঘুরিয়ে দিয়েছি হালের চাপ দিয়ে দিয়ে। কাপ্তেন রেনল্ড, কাপ্তেন উইলিয়ামস-এর সঙ্গে কাজ করার সময়ে সুযোগ পেলেই বোটে চড়ে বসতাম আমি, এবং নৌকো বাওয়ার কায়দাগুলি শিক্ষা করতাম অভিজ্ঞ নাবিকদের কাছে। কাজেই, স্থির সমুদ্রে ভেলা চালানো খুব কঠিন হল না আমার পক্ষে।

জাহাজের দিকে চাইছি ঘন ঘন। যেভাবে ফেলে গিয়েছিলাম পরশু রাত্রে দারুণ দুর্যোগের সময়, সেইভাবেই রয়েছে, শুধু এইটুকু তফাত যে তখন ও ছিল এক পাশে হেলে, এখন বসে আছে প্রায় সোজা হয়ে। হঠাৎ আমার যেন সব কিছু ভুল হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। মনে হল—আমাদের বারোটা নাবিক এক্ষুণি দেখা দেবে, কেউ পাটাতনে, কেউ মাস্তুলে, আর পাহারাদার এক্ষুণি আমাকে লক্ষ্য করে হেঁকে উঠবে—"এ্যাহয়! এ্যাহয়! ভেলা কার?"

ক্ষণিকের মতিভ্রম ক্ষণিকেই ছুটে গেল অবশ্য। আমি গিয়ে ভেলা লাগালাম জাহাজের গায়ে। এক জায়গায় এক গাছি দড়ি ঝুলছিল ডেক থেকে, তা না হলে জাহাজের গা বেয়ে ওঠা ছাড়া গতি ছিল না, অথচ সেটা আমার সাধ্যে কুলোত কিনা, সন্দেহ। ও কাজ দক্ষ নাবিকেরাও পারে না অনেকে। যা হোক, আমি দড়ি ধরে তরতর করে উঠে গেলাম উপরে। ডেক-এ দাঁড়িয়ে

চা।রদিকে চেয়ে দেখলাম একবার, মনটা দারুণ মুষড়ে গেল হারিয়ে-যাওয়া সঙ্গীদের কথা স্মরণ করে, যাদের একজনকে অদূরে উবুড় হয়ে ভাসতে দেখে এসেছি জলে। বাকীরাও হয়ত ঐ ভাবেই ভেসে বেড়াচ্ছে এদিকে ওদিকে। কেউ যদি জীবিত থাকত, সে কি আর কোন সাড়া বা সংকেত দিত না এই দুই দিনের মধ্যে ?

এবার নিজেকে ঝাড়া দিয়ে চাঙ্গা করে তুললাম। ভাবালুতা এ-সময়ে সর্বথা পরিহার্য। প্রতি মুহূর্ত মূল্যবান্। অঢেল কাজ সমুখে আমার। তৎপর হতে হবে। পকেটের ফলগুলি চটপট উদরে পাঠিয়ে দিলাম। খালি পেটে খাটা যায় না। জাহাজের ভাঁড়ার খুঁজে দেখব পরে। এখন প্রথম কাজ হল আমার নড়বড়ে ভেলাকে নতুন করে গড়া। যে-ভেলায় চড়ে আমি জাহাজে এসে উঠলাম, তাতে করে কোন মাল বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। যেমন ছোট, তেমনি পলকা।

তড়বড় করে আমি নেমে গেলাম জাহাজের খোলে। তলা ফেঁসে গিয়েছে যখন, কিছুসংখ্যক তক্তা হয়ত খুলে গিয়ে থাকতে পারে। আর সেসব তক্তা হল ওক কাঠের ভারী মজবুদ তক্তা। তুলতে পারলে ভেলা গড়ার পক্ষে তা হবে খুব দামী জিনিস। জোয়ারের সময় নিশ্চয়ই সমুদ্রের জলে খোল ভরতি ছিল, এখন জোর ভাটি। জল থাকেও যদি, খুব কমই আছে হয়ত।

সব অনুমানই ঠিক. জল কম, এবং আলগা তক্তা ভাসছেও কয়েকটা। আমি সেইগুলি কুড়িয়ে নিয়ে এলাম উপরে। তারপরে ছুতোরের ঘর থেকে নিয়ে এলাম তার সব যন্ত্রপাতি—করাত, তুরপুন, বাটালি, হাতুড়ি, গজাল, পেরেক। তারপর আহার নিদ্রা ত্যাগ করে খাটতে লাগলাম অসুরের মত। সেদিন শেষ হল না ভেলা, সুতরাং আমারও ফেরা হল না কূলে। রয়ে গেলাম সেই ভাঙ্গা জাহাজে ভগবান স্মরণ করে। যেমন-তেমন একটু ঝড় ওঠে যদি, জাহাজ-সমেত আমার সলিল সমাধি অনিবার্য জেনেও।

ছয়

ঝড় উঠল না। জাহাজ যেভাবে ছিল, সেইভাবেই রয়ে গেল। সারাদিন খাটুনির পরে আমার নিজের কেবিনেই আরামে ঘুমোলাম আমি। এমন আশ্চর্য লাগছিল! মাঝখানে যে একটা প্রলয়ংকর ব্যাপার ঘটে গিয়েছে, পদে পদে তা ভুল হয়ে যাচ্ছিল আমার।

তিনটি জীবিত প্রাণী আমি পেয়েছি জাহাজে এসে। একটা কুকুর, দুটো বেড়াল। তারা বন্ধ ছিল ঘরের ভিতর। আমি দরজা খুলে দিতেই তারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার গায়ের উপর। আমি তাদের খাবার দিলাম। গায়ে হাত বুলিয়ে আশ্বস্ত করলাম। এবং ডাঙ্গায় যাওয়ার সময় তাদেরও নিয়ে যাব বলে আমি মনস্থ করলাম।

এবারকার ভেলা বেশ বড়ই হল। আর মজবুদও তেমনি। চার-কোণে চারটি মুখবন্ধ পিপের উপরে ভেলার কাঠামো। কাজেই জলের অন্ততঃ দেড়ফুট উপরে যে তা ভাসবে, তাতে ভুল নেই কিছু। যতই মাল চাপাই, আর মালের ভারে যতই নেমে পড়ুক ভেলা, জল তাতে উঠবে না বলেই বিশ্বাস আমার। আট ফুট লম্বা, ছয় ফুট চওড়া এই ভেলার চারদিকে আবার রেলিং বসানো। কাজ শেষ হতে ঠিক তিন দিন লাগল আমার। এ তিনদিন আমি জাহাজ থেকে নড়ি নি, জাহাজের সঞ্চিত খাবার খেয়েছি, এবং কী কী মাল প্রথম দফায় নেব তার তালিকা তৈরি করেছি।

প্রথম দফার কথা বলছি এইজন্য যে প্রয়োজনীয় কোন জিনিসই আমি জাহাজে রেখে যাব না। রেখে গেলে সমুদ্রে ডুববে। নিয়ে গেলে অশেষ কাজে আসবে আমার। দ্বীপে ত কিছুমাত্র জিনিস

নেই, বনজ সম্পদ ছাড়া। সে-সব সম্বল করে থাকতে হলে আমাকে বুনো মানুষের জীবনই যাপন করতে হবে। অথচ সভ্য মানুষের প্রয়োজনীয় সবই ত এখানে আছে। নিয়ে যেতে পারি যদি, এই পৃথিবী ছাড়া বিজন দেশেও আমি সভ্য জীবনই যাপন করতে পারব। অন্ততঃ ততদিন পারব, যতদিন আমার সঞ্চয় না ফুরোবে।

তৃতীয় দিন প্রভাতে আমি ভেলায় মাল বোঝাই শুরু করলাম। ভেলা আমি গড়েছি জলের উপরেই, আগের ক্ষুদে ভেলায় বসে বসেই। তাতে মেহনত তখন বেশী হয়েছে বটে, কিন্তু এখন আর ভেলা নামাবার ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে না।

প্রথমেই ভেলায় নামিয়ে দিলাম হু'খানা পাল, তাঁবু খাটাব এ-দিয়ে। তারপর হুটো বন্দুক, বুলেট বারুদ সহ। তারপর ছুতোরের যন্ত্রপাতি সব। তারপর খাবার সব রকম কিছু কিছু এবং কিছু শয্যাদ্রব্য। হুটো বাক্স নামিয়ে দিলাম, একটা নিজের, একটা কাপ্তেন পিক্রুজের। এসব হল কাপড়ের বাক্স। বাক্স অবশ্য ভেলার উপর থাকবে না, জলে ভেসে ভেসে ভেলার সঙ্গে সঙ্গে চলবে। ভেলার সঙ্গে বাঁধা আছে দড়ি দিয়ে। বাঁধা নেই, অথচ ভেসে ভেসে চলবে কুকুরটা। ও এত-বড় বৃহদাকারের কুকুর যে ওকে উপরে তুলতে গেলে ভেলার অর্ধেক জায়গাই ও একা দখল করে বসবে! মাল রাখব কোথায়? তা ছাড়া, কুকুর সাঁতারে দক্ষ, আর আমার এ-কুকুরের এমন তাকত আছে যে অনায়াসে শান্ত সমুদ্রে এটুকু পথ ও সাঁতরে যেতে পারবে। বেড়াল হুটোকে অবশ্য ভেলাতেই স্থান দিতে হল।

অবশেষে বেলা নয়টা আন্দাজ এবারকার মত জাহাজ থেকে নেমে এলাম আমি। আবার আসব, অনেকবার আসব, ততদিনই আসতে থাকব, যতদিন সমুদ্রগর্ভে ও বিলীন হয়ে না যাচ্ছে। সব মালপত্র নিয়ে যাবার পরও আসব। প্রিয়জনের কবরের পাশে গিয়ে মানুষ বসে না? তখন আসব সেই রকম মনোভাব নিয়ে! যে

সভ্য জীবনের সঙ্গে আমার নাড়ীর বাঁধন ছিল, তারই কথা স্মরণ করবার জন্য এসে বসে থাকব মাঝে মাঝে।

ভেলা ছাড়লাম জোয়ারের মুখে। স্রোত তখন প্রবলবেগে খালের ভিতরে গিয়ে ঢুকছে। কুকুর এবং বাক্স সঙ্গে নিয়ে আমার নিজ হাতে গড়া জলযান নির্বিঘ্নে গিয়ে খালে প্রবেশ করল। যেখান থেকে সেদিন ছেড়েছিলাম লতায়-বাঁধা ভেলা, সেইখানেই আজ এসে ভিড়ল এই নতুন ভেলা, বহু মালপত্র বোঝাই নিয়ে।

তখন আর এক দফা ভূতের খাটুনি। মাল খালাস করা, ডাঙ্গায় তোলা। বেলা গড়িয়ে গিয়েছে অপরাহ্ণের দিকে, ঘণ্টা তিন চারের বেশী সময় আমি পাব না কাজ করবার জন্য। মালগুলি চটপট টেনে তুললাম, ভেলাটাকে খোঁটা পুতে শক্ত করে বাঁধলাম কূলের সঙ্গে, তারপর কুড়োল নিয়ে ছুটলাম বনের দিকে। এবার একেবারে একা নই, কুকুরটাও সঙ্গে গেল আমার।

সোজা এবং সরু দেখে দুটো গাছ কেটে ফেললাম তাড়াতাড়ি। ডালপালা ছেঁটে দিয়ে টুকরো করে ফেললাম গোটা চারেক। একে একে বয়ে নিয়ে এলাম খালের ধারে। প্রথম তাম্বু এখানেই হোক, তারপর দেখে শুনে স্থায়ী বসবাসের যোগ্য স্থান বাছাই করে নেব। শাবল কোদাল সবই এনেছি জাহাজ থেকে। দুটো গর্ত করলাম আট ফুট ব্যবধান রেখে, তাতে বসালাম দুটো খোঁটা। সেই খোঁটার মাথায় চড়িয়ে দিলাম আর একখানা কাঠ। ব্যাস্, তাঁবুর কাঠামো তৈরি। এইবার একখানা পাল তার উপরে ফেলে দেওয়া। এই কাজটাই দাঁড়াল সবচেয়ে শ্রমসাধ্য। পালের সঙ্গে দড়ি বেঁধে কাঠামোর উপর দিয়ে সেই দড়ি ফেলে দিতে হল। তারপর উলটো দিকে দাঁড়িয়ে এই টান, আর এই টান। অনেক কষ্টে উপরের আড়-কাঠ পার করে এনে ফেললাম সেই পাল। ব্যাস্, আর মেহনতের কিছু নেই। দুইদিকে সমান ভাবে যখন ঝুলতে থাকল আচ্ছাদনটা, তখন যতদূর সম্ভব দূরে টেনে নিয়ে তার প্রান্তগুলো

বেঁধে দিলাম, মাটিতে খাটো খাটো খোঁটা পুতে। তাঁবু আমার খাড়া হয়ে গেল তা হলে। কিন্তু বেলাও আর নেই। তা না থাকুক। কাজও আমার বাকী নেই বেশী। দ্বিতীয় একখানা পাল দিয়ে তাঁবুর চারিপাশ ঘিরে দেওয়া মাত্র। এ-পালটা লম্বাই আছে, চারিধার বেড় দিয়ে ভিতরটাকে বেশ সুরক্ষিত করে ফেললাম এর সাহায্যে।

এর পর মালগুলো ভিতরে টেনে আনা, এবং পালের ঘেরার পাশে পাশে সাজিয়ে দেওয়া, যাতে বেড়া উঁচু করে বন্য পশু কিছু ভিতরে ঢুকতে না পারে। অবশ্য তাঁবুর বাইরে পাহারায় থাকবে কুকুর জিম, আর ভিতরে থাকব আমি, বন্দুক শিয়রে রেখে। তার উপরেও ভরসার কথা, ইতিপূর্বে দুই রাত্রি আমি কাটিয়ে গিয়েছি এখানে, বন্য জন্তুর কোন সাড়া পাইনি তেমন। সেদিক দিয়ে স্থানটাকে নিরাপদ বলেই মনে হচ্ছে।

একটু আগুন জ্বেলেছি ভিতরে, জাহাজ থেকে যে-খাবার এনে-ছিলাম, খাচ্ছি তাই। এক অসুবিধা, বাসন-কোসন কিছুই পাইনি জাহাজে। রান্নাঘর ছিল খোলের ভিতর। তলা ফেঁসে গিয়ে যখন জল উঠল, তখন সে সব বাসন তলিয়ে গেল সেই জলে। সে জল আবার নামল এক সময়, নামার সময় বাসনগুলিকে নিয়ে গেল সঙ্গে। এখন আমার পাঁউরুটি আছে, তা সেঁকবার কোন উপায় নেই। আগুনের উপরে একবার এপিঠ, একবার ওপিঠ ধরছি রুটির, তার পরই কামড়াচ্ছি আস্ত রুটি। বাসন যেমন নেই, কাঁটাচামচও নেই তেমনিই।

খেতে খেতে ভাবছি ভবিষ্যতের কথা। এই রুটির কথাই। জাহাজে রুটি তৈরির ব্যবস্থা ছিল। রোজ তৈরি হত। এখন তৈরি হবে কী উপায়ে? ওর জন্য বিশেষ ধরনে উনুন বানাতে হয়, তা বানানো সম্ভব না হতে পারে। তার উপর ময়দার সঙ্গে অনেক কিছু মালমসলা মেশাতে হয় রুটি তৈরি করতে হলে। সে-সব ত

কই চোখে পড়ল না জাহাজে। সম্ভবতঃ তাও ভেসে গিয়েছে। এ-ছাড়াও ময়দার প্রশ্ন রয়েছে। তা অবশ্য আছে প্রচুর, কিন্তু আমাকে যদি সারা জীবন থাকতে হয় এই অভিশপ্ত নির্জন পুরীতে?

পরের দিন আবার আমি জাহাজে চলে গেলাম সকালে, ফিরে এলাম বিকালে, ভেলা-বোঝাই মাল নিয়ে। এবার প্রধানতঃ অস্ত্র-শস্ত্রই এনেছি। বন্দুক গোটা বারো, পিস্তল দুটো, টোটা বারুদ প্রচুর পরিমাণ। এক পিপে বারুদ জলে ভিজে চাপ বেঁধে গিয়েছিল, তবু আমি এনেছি তা। চেষ্টা করে দেখব—রোদ্দুরে শুকিয়ে আবার তা ব্যবহারের উপযোগী করা যায় কিনা।

এই বারুদ নিয়ে আবার দুশ্চিন্তা হল একটা। কোথায় রাখি এ জিনিস? এক ফুলকি আগুন এসে পড়ে যদি, তিন পিপে বারুদ ত যাবেই, সঙ্গে সঙ্গে ফাউ যাবে আমার যাবতীয় জিনিসপত্র, চাই কি আমি নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারি। একে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখা সর্বাগ্রে দরকার। কোথায় পাই সে নিরাপদ জায়গা?

রোজ সকালে জাহাজে যাই, রোজ বিকালে এদিক ওদিক খুঁজি। একটা নিরাপদ জায়গা যে একান্তই চাই! স্বভাবতঃই ঐ পাহাড়ের দিকে খোঁজাখুঁজি বেশী করছি। দ্বীপের গোটা পশ্চিম দিকটা জুড়ে আছে ঐ পাহাড়। ওর গায়ে কি কোথাও একটা গুহা নেই? আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম।

অবশেষে খালের খুব কাছেই পেলাম গুহা। গাদা গাদা ঝুরো পাথরে ওর মুখটা আড়ালে পড়েছিল, তা না হলে প্রথম নজরেই ওর অস্তিত্ব টের পেতাম। খালের কাছে এসে পাহাড় ডাইনে ঘুরেছে, একথা আগেই বলেছি। মোড়ের মুখেই এই গুহাটা, খালের উলটো দিকে। গুহার সামনেটা পাথরে পাথরে আকীর্ণ বটে, কিন্তু সে-সব পাহাড় থেকে গড়িয়ে-আসা পাথর, তুলে ফেললেই স্থানটা সমতল হয়ে যেতে পারে।

গুহার ভিতরে গিয়ে দেখলাম, ওর আয়তন ছোট। আমার মালপত্রই সব ধরবে না ওতে। আর আমার নিজের ত ওর ভিতরে থাকার-প্রশ্নই ওঠে না, দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। স্থির করলাম, মাল-পত্রই থাকবে গুহাতে। তার স্থান সংকুলান যাতে হয়, সেই উদ্দেশ্যে পাহাড়ের গা কেটে কেটে আয়তনটা বাড়িয়ে নেব ক্রমশঃ। আর নিজের থাকার জন্য গুহার ঠিক সামনেই এনে তুলব আমার ঐ তাঁবুটা। শুধু সামনে নয়, একেবারে গা ঘেঁষে, কিছুমাত্র ফাঁক না রেখে।

এই ভাবেই কাজ শুরু করলাম। মালপত্র গুহাতে এনে ফেলছি কিছু কিছু করে। সকলের আগে এনেছি বারুদের পিপে। তারপর অন্য যা কিছু জাহাজ থেকে এনেছি। এনেছি সামান্যই, আনতে বাকী আছে আরও অনেক। এখনও এক মাস ধরে রোজ যদি এক এক ভেলা মাল আনতে থাকি, তাহলেও সব কিছু এনে ফেলতে পারব বলে ভরসা করি না।

তবে এক কথা, আবহাওয়া ভালই চলছে। সেই সর্বনাশা টাইফুনের পরে আর কোনদিন না হয়েছে ঝড়, না হয়েছে বৃষ্টি। কোন্ সময়ে যে এ দেশে ঝড় বৃষ্টি হয়, কোন্ সময়ে হয় না, তা কিছুই বুঝতে পারছি না। হয়ত পারব, যদি দুই তিন বছর ধরে এখানকার আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ (অথবা দুর্যোগ ?) আমার হয়।

অবশেষে জাহাজে আর এমন কিছু মাল রইল না, যা আমার নিয়ে আসা দরকার বা সম্ভব। তখন আমি সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করলাম। ওতে সময় যায় অনেকটা, বলতে গেলে দিনমানের বেশীর ভাগটাই বাইরে থাকতে হয়।

ভেলাখানা অপরিসীম কাজ দিয়েছে। এইবার ওকে খালের মুখে বেঁধে রেখে দিই। চারিপাশে গোঁজা পুতে, যাতে স্রোতের টান তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে। ঘন বর্ষায়



একটি পদচিহ্ন। মানুষের পায়ের দাগ [পৃঃ ৮৬

ওর উপরে পাতালতার আচ্ছাদনও দেব একটা, তবে সে কাজ পরের।

পুরো সময়টাই এখন গেরস্তালি গুছিয়ে নেওয়ার পিছনে দিতে পারছি। গুহার দেওয়াল কেটে কেটে আয়তন বাড়িয়ে নিচ্ছি ওর। ভাগ্যিস পাথরটা বেলে পাথরের মত একজাতীয় নরম জিনিস, কেটে নামানো এমন কিছু মেহনতের কাজ নয়।

একটাই গুহা পেয়েছি আমি, আরও দুই একটা নিজে তৈরি করে নেব, ভাবছি। এক কোণ থেকে দরজা বার করলাম খুঁড়ে খুঁড়ে। সেই দরজা-বরাবর খুঁড়ে যেতে থাকলাম একটা গলিপথ। উপরে ত পাহাড়ের ছাদ আছেই, দুই পাশে পাথরের দেওয়াল, সমুখে পাথর কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছি আমি। এই গলির দুই পাশে সারি সারি মালপত্র সাজানো। এবং এই গলির শেষ মাথায় থাকবে দ্বিতীয় গুহা একটা। অন্তঃপুর আমার।

কিন্তু বিড়ম্বনা দেখ, সেই অন্তঃপুরই হয়ে দাঁড়াল বৈঠকখানা কালক্রমে। দ্বিতীয় গুহার কিছুটা অংশ খুঁড়ে ফেলার পরই একদিন চমকে গেলাম। শাবলের ঘা দেওয়া মাত্র পাথরের দেয়াল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল বাইরের দিকে, আর নবসৃষ্ট ফোকর দিয়ে আমার মুখের উপর এসে আছড়ে পড়ল ঝলকে ঝলকে প্রখর দিবালোক। পাহাড় শেষ, সমুখে সমুদ্র। আমি তাড়াতড়ি আবার টুকরো টুকরো পাথর দিয়ে বন্ধ করি সেই ফোকর তখন। দুই জোড়া দরজা আমি জাহাজ থেকে খুলে এনেছি বটে, তার এক জোড়া এখানে বসাবার মতলব রইল। তা যতদিন না হয়, পাথর দিয়েই বন্ধ থাকুক এই ভবিষ্যতের সিংহদ্বার।

গুহার সামনে তুলেছি আমার তাঁবু, যেটা আগে খালের ধারে তুলেছিলাম। আর সেই তাঁবুর বাইরে সারি সারি ডাল পুঁতে দিয়েছি নানাজাতীয় গাছের। আশা করছি যে বর্ষা পড়লে এই সব ডাল শিকড় ছাড়বে মাটির তলায়, বড় বড় গাছ গজিয়ে উঠে

আমার তাঁবুকে আড়াল করে রাখবে কৌতূহলীদের দৃষ্টি থেকে। সেই সবুজ প্রাচীর যতদিন না উঠছে, খালে নৌকো বেয়ে যে-কেউ আসুক, প্রথমেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে একটা হলুদ তাঁবু। বিপদের কথা নিশ্চয়ই। কারণ এ স্থানে এখন পর্যন্ত জনমানবের চিহ্ন আমি যদিও দেখতে পাইনি, তবু এখানে মানুষ যে মোটেই নেই বা কোনদিনই আসবে না, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত হচ্ছি কেমন করে?

আর মানুষ যদি আসে, তারা যে নরখাদক বর্বর মানুষই হবে, এটাও আশঙ্কা করবার সংগত কারণ আছে। ওরিনোকোর কূলে বসে অনেক গল্প শুনেছি। উত্তর আটলান্টিকে যেসব দ্বীপপুঞ্জ আছে, তাতে নরমুণ্ডশিকারী আর নরমাংসবিলাসী অপমনুষ্যদেরই বাস বলে ঘোষণা করেছে সেসব গল্পের কথকেরা। তারা সবাই কি আর বাজে কথা বলেছে?

বাসস্থান সুরক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যসংস্থানের চেষ্টাও আমার সময় নিচ্ছে যথেষ্ট। জাহাজ থেকে কিছু খাদ্য পেয়েছিলাম, তা ঠিক। কিন্তু তা ত ফুরিয়ে এসেছে! কিছু ময়দা এখনও আছে ভাঁড়ারে, আর আছে কিছু মদ। মদটা আমি খুব কম খরচ করি। ও-জিনিস পুরোনো হলে খারাপ হয় না, বরং ভালই হয়। অথচ অসুখে বিসুখে পড়লে ছোট এক গেলাস মদ শরীরটাকে চাঙ্গা করে তোলার পক্ষে অশেষ উপকার দেয়। আমায় যে সারা জীবনই এখানে থাকতে হবে, এটা আমি একরকম ধরেই নিয়েছি। সুতরাং থাকুক ঐ মদের ভাণ্ডার অক্ষয় হয়ে।

ময়দার কথা অবশ্য আলাদা। বেশীদিন রাখা যায় না ও-জিনিস। পোকা হয়ে যায় ওর ভিতরে, দলা পাকিয়ে যায়, দুর্গন্ধ ছাড়তে থাকে। কাজেই প্রয়োজনমত ওর খরচ করি বইকি! পাঁউরুটি তৈরি করা অবশ্য সাধ্যের বাইরে আমার, কিন্তু হাতের থাপড় মেরে মেরে চাপাটি বানাই আমি, আর আগুনে তা সেঁকে নিই। মাংসের সঙ্গে খেতে মন্দ লাগে না।

মাংসের অভাব আমার নেই। দ্বীপটায় বন্য ছাগ অসংখ্য। দলে দলে তারা ঘুরে বেড়ায় মাঠে জঙ্গলে পাহাড়ের গায়ে গায়ে। যখন খুশী বন্দুকের গুলিতে আমি অনায়াসেই মেরে নিতে পারি একটা। প্রথম প্রথম নিতামও তাই। এখন আর তা করি না। কয়েকটা ছাগল খোঁড়া করে দিয়েছিলাম গুলি মেরে। ধরে এনে আটকে রেখেছিলাম। আমার তাঁবুর বাইরে যে বৃক্ষপ্রাচীরে-ঘেরা জায়গাটুকু, সেইখানে করেছিলাম তাদের খোঁয়াড়। সেখানে এসে পা তাদের ভাল হয়ে গেল ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে পোষও মানল তারা। বেড়ার গাছ যখন বেঁচে উঠল বর্ষাকালে, তখন তাদের কচি পাতা খেয়ে খেয়ে ওরা নধর পরিপুষ্ট হতে লাগল দিনে দিনে। তখন আমি এক একটাকে কাটি, আর চার পাচ দিন বসে কাটলেট খাই। কাটলেট অর্থে অবশ্য ঝলসানো মাংসই বুঝতে হবে।

ছাগেদের বংশবৃদ্ধি খুব দ্রুতই হয; আমার ছাগমাংস বা ছাগ-দুগ্ধের অভাব রইল না মোটেই। আর এক উপাদেয় খাদ্যের ব্যবস্থা আমার হয়েছে। কচ্ছপের সন্ধান পেয়েছি দ্বীপের উত্তরাংশে। মাংসের জন্য ততটা নয়, ডিমের জন্যই এদের আমি শিকার করি। শিকার করাও অতি সহজ। কোন অতিকায় কচ্ছপ সমুদ্র থেকে উঠে অতি মন্থর গতিতে ডাঙ্গায় পায়চারি করছে, এইটি দেখতে পেলেই একখানা মোটা লাঠি হাতে নিয়ে আমি দৌড়ে যাই, আর লাঠির ডগা কচ্ছপের পেটের তলায় ঢুকিয়ে এক চাড় দিয়ে তাকে উল্টে ফেলে দিই। ব্যাস্, তার আর নড়ন চড়নের ক্ষমতা নেই। ধীরে সুস্থে তার পিঠ আর পেটের জোড়ের মুখে ছুরি বসিয়ে দিয়ে টান দিলেই পিঠের খোলাখানা আলাদা হয়ে গেল। ভিতরে অঢেল মাংস, তবে তা ছাগমাংসের মত স্বাদু নয়, সাধারণতঃ আমার কুকুর জিমেরই ভোগে লাগে তা। আমি আত্মসাৎ করি ওর ডিমগুলি, তা পঞ্চাশ ষাটটা ডিম একটা কচ্ছপের পেটে হেসে খেলে পাওয়া যায়।

কাপড় সব ছিঁড়ে এসেছে। মজ্জাগত সংস্কার বশতঃ নিরাবরণ থাকতে কেমন-কেমন লাগে। জাহাজ থেকে নাবিকদের বাক্সগুলি সবই নিয়ে এসেছিলাম, পোশাক-আশাক সবে মিলিয়ে পেয়েছিলামও প্রচুর। সবই একদিন শেষ হল। তখন আমি চামড়া পরতে শুরু করলাম। ছাগের চামড়াই প্রধানতঃ। লোমগুলি যথাযথ বজায় রেখে দিই বাইরের দিকে, তাতে শীত কম লাগে গায়ে, বৃষ্টির জলও গায়ে বসতে পারে না। কিম্ভূতকিমাকার দেখায় অবশ্য, তার আর উপায় কী? আর এখানে আমাকে দেখছেই বা কে?

ছুরি কাঁচি, এমন কি ক্ষুরও জাহাজে পেয়েছিলাম। কাজেই চুল আমি ছাঁটি, দাড়িও বেশী লম্বা হতে দিই না। দিলে অস্বস্তি বোধ হয়, কাজকর্মেরও অসুবিধা হয় কখনও কখনও। ধর আমি কুড়োল হাঁকাচ্ছি একটা গাছ কেটে নামাবার জন্য, জোর-হাওয়া তখুনি আমার লম্বা দাড়ি ওড়াতে লাগল এদিকে ওদিকে। চোখের নজর বাধা পেলো উড়ন্ত দাড়িতে, কুড়োলের কোপ গাছের গোড়ায় না পড়ে পায়ে এসে লাগল। তখন? অবশ্য সত্যি সত্যি পায়ে এসে লাগেনি কোনদিন। কিন্তু একদিন একখানা পা অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিল। সেই থেকে আমি সংকল্প করলাম, উড়বার মত দৈর্ঘ্যে পৌঁছোবার আগেই দাড়িকে আমি কচাকচ কেটে দেব।

দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায় এইভাবে। মেরিয়ানা জাহাজ থেকে যেদিন আমি সাগর তরঙ্গের ঠেলা খেতে খেতে জীবন্মৃত অবস্থায় এসে উঠেছিলাম এই জনহীন দ্বীপে, সেইদিন থেকে সময়ের একটা হিসাব আমি রেখেছি। দৈনিক এক একটা দাগ কেটেছি। প্রথম কাটতাম এক গাছের গায়ে, এখন কাটি গুহার দেয়ালে। সাতদিন পরে পরে দাগগুলির যোগফল লিখি ৭। তিরিশ দিন পরে পরে নাম লিখি নতুন মাসের, নতুন দিনের। বছরের পরেও বড় বড় হরফে নতুন সালের সংখ্যাটা লিখে রাখি দেয়ালে। এইভাবে মোটামুটি হিসেব আমি রেখেছি একটা। মোটামুটি! কারণ

হিসেবটা যে নির্ভুল ভাবে রাখা সম্ভব হয় নি, এমন একটা সন্দেহ আমার নিজের মনেই আছে। সম্ভব হয় নি, মানে প্রথম দিকে আমি এখানে মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়তাম। জ্বর হত, গায়ে অসহ্য ব্যথা হত, এক একদিন অজ্ঞান হয়ে যেতাম, সেই অবস্থায় দেয়ালে দাগ দেওয়া ঘটে উঠবে কেমন করে? একবার ত জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরে আমি এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে ঘুমের ভিতর একাধিক দিনই কেটে গিয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস। তা যদি গিয়ে থাকে, দিনপঞ্জী থেকে দুই একদিন ছুটও গিয়ে থাকতে পারে।

যা হোক, মোটামুটি হিসেব আছে আমার। বৎসরের পরে বৎসর গড়াতে গড়াতে আমি আজ প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছেছি। এসেছিলাম কুড়ি বৎসরের নবীন যুবক, আজ আমার বয়স—হিসাব করলে চমকে উঠি, এই সাতচল্লিশ বৎসর। সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসর আমি কাটিয়েছি এই বিজন দ্বীপে।

কাটিয়েছি রুশ সম্রাটের মত নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিয়ে। ভূখণ্ডটার সর্বত্র পরিক্রমা করা সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে, তবু যতটা জায়গা ঘুরেছি, তাতে নিজের প্রভুত্বের কিছু-না-কিছু চিহ্ন স্থায়িভাবে এঁকে দিয়েছি। দ্বীপের তিন অংশে তিনটি বাড়ি তৈরি করেছি আমি। কাঠের ঘর, কাঠের ছাউনি দেয়াল মেজে, সমুখে অর্ধবৃত্তাকার উঠোন একটা, সে উঠোন জ্যান্ত গাছের বেড়া দিয়ে দুর্ভেদ্য করে ঘেরা। বেড়ার ভিতর দিকে হেলান দেওয়া থাকে একটা ছোট মই। আমি যখন আসি, বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে সেই মই টেনে আনি, মই লাগিয়ে বেড়া পেরিয়ে যাই। কোন দরজা নেই উঠোনে ঢোকার। হিংস্র শ্বাপদ যদিও নেই এদেশে, তবু তাদের বিরুদ্ধে সদাসতর্ক আমি।

এই তিন বাড়িতেই কিছু কিছু পোষা ছাগ আছে আমার। এরা খায় উঠোনের ঘাস, বেড়ার গাছের পাতা। তা ছাড়া আমি

দশ পনেরো দিন পরে পরে এক একবার যাই তাদের দেখতে, বাইরের ঘাস পাতাও পাঁজা করে দিয়ে আসি তাদের।

ছাগ ছাড়াও আর একরকম খাদ্যভাণ্ডার আছে এসব বাড়িতে। সে হল শুকনো আঙ্গুর। আঙ্গুর লতা বনে বনে অসংখ্য। আর তাতে আঙ্গুর যা ফলে, তাও অপূর্ব। যেমন বৃহৎ, তেমনি স্বাদু। আঙ্গুরের সময়ে আমি নিত্যই ত তা খাই পেট ভরে, তা ছাড়া সারা বছরের জন্য শুকিয়ে রাখি রাশি রাশি। এগুলি গোলাজাত করা থাকে এই তিন বাড়িতে সমানভাগে। বলা ত যায় না, একটা বাড়ি যদি দৈবাৎ শত্রুহস্তগত হয়, তবু আরও দুটো বাড়ি আমার থাকবে।

সাতাশ বছর গেল। এর ভিতর দু'টি কাজ করেছি আমি। প্রথমতঃ, নৌকা তৈরি করেছি একখানি। খুব বড় নয়। একা একাই চালানো যায়, কিন্তু প্রয়োজনে পাঁচ ছয় জনেরও স্থান হতে পারে এতে। এর কথাই বলি আগে।

কী করে গড়লাম নৌকা? সে অনেক ব্যাপার। চেষ্টার অসাধ্য যে কোন কাজই নয়, তাই প্রমাণ করেছি আমি। দীর্ঘ সাতটি বছর লেগেছে নৌকাখানি করতে। সভ্য দেশে যে-জাতীয় নৌকা সচরাচর দেখা যায়, এটি সেরকম নয় মোটেই। সে রকম করতে হলে আমার এই একটা জীবনে কুলোত না নিশ্চয়ই। প্রথমতঃ গাছ থেকে তক্তা বানাতে হত—

সে যে কী বৃহৎ ব্যাপার আমার এই বর্তমান পরিস্থিতিতে, তাই বোঝাবার জন্য একটা গল্প বলি। গুহার ভিতরে স্থান সংকুলান হয় না বলে দেয়ালে একটা তাক টাঙ্গাবার মতলব করেছিলাম। তার তক্তা কোথায় পাই? ভেলাখানা ভাঙ্গতে পারি না, কারণ নৌকা তখনো কল্পনার বস্তু হয়েই রয়েছে। ভেলা ভাঙ্গলে অবশ্য একটা কেন, পাঁচ ছয়টা তাক হতে পারত। কিন্তু তা যখন ভাঙ্গবই না, তখন উপায়ান্তর হচ্ছে গাছ কেটে তক্তা বানিয়ে নেওয়া। সে কাজ সহজ হত বড় করাত থাকলে। জাহাজ থেকে আমি পেয়েছি মাত্র

একখানা ছোট হাতকরাত। তা দিয়ে ত আর গাছ চেরাই করা যায় না! তবু গাছ কেটেই আমি তক্তা বার করেছিলাম। পুরো দুই বৎসরের মেহনতে।

তবু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে নৌকা আমার বানাতেই হবে। সমুদ্রে আমায় বেরুতেই হবে। অনেক দূর-সমুদ্রে। দূরবীন আমার রয়েছে, তা দিয়ে দিগন্ত সীমায় যে কালো কালো ছায়াগুলি দেখা যায়, সেগুলি কোন ভূখণ্ড কিনা, আমার জানা দরকার। হয়ত ওগুলো কোন বৃহৎ দ্বীপ, যেখানে ইওরোপের জাহাজ যাতায়াত করে। যদি তাই হয়, তবে ত ওখানে পৌঁছানো মানেই এ নির্জন কারা থেকে মুক্তিলাভ!

হ্যাঁ, নৌকা একান্তই চাই আমার। সভ্যজাতিরা যে নৌকা তৈরি করে, তা অবশ্য সুশ্রী, মজবুত এবং নিরাপদ। কিন্তু অসভ্য-দেরও নৌকা আছে। দেখতে কদাকার, নিরাপদও নয় ঝড়-ঝাপটার সময়, তবু আবহাওয়া যখন ভাল থাকে, বুনো জাতিরা সেই সব ঢাউস বদখত জলযানেই সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ে। হয়ত প্রতিবেশী কোন দ্বীপে যেতে নয়ত মাছ ধরতে, এমন কি লড়াই করতেও।

আমি ঐ রকমই একখানা নৌকা গড়ব।

তার জন্য চাই একটা অতি বৃহৎ গাছ কেটে ফেলা। যে গাছের বেড় হবে অন্ততঃ দশ ফুট। তার পর সে গাছটার অবস্থান হওয়া দরকার সমুদ্রের কাছাকাছি, নইলে নৌকা তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে একার শক্তিতে তা জলে ভাসানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

তেমনি গাছ একটা পেলাম, সমুদ্রের থেকে একশো গজের ভিতরেই। কাটতে শুরু করলাম সে গাছ। কেটে নামাতেই প্রায় এক মাস গেল। তারপর পনেরো ফুটের মাথায় একটা টুকরো করা। তাতে আরও এক মাস প্রায়। এই ভাবে একটা সুগোল সুডৌল গুঁড়ি বেরুলো, যার দৈর্ঘ্য পনেরো ফুট এবং ব্যাস চার ফুট। এখন

আমার কাজ হল, এই গুঁড়ির ভিতরকার কাঠ কুরে কুরে বার করা। এমন ভাবে কুরতে হবে, যাতে শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে একখানা গোটা কাঠের নিটোল নৌকা।

কত দিন লেগেছিল কুরতে? তিন বৎসরেরও কিছু বেশী। বাটালি হাতুড়ি সম্বল কিনা! তারপর আর এক বৃহৎ কাজ হাতে নিতে হল। গাছ যেখানে ছিল, নৌকা সেখানেই তৈরী হয়েছে। জল সেখান থেকে একশো গজ তফাতে। এই একশো গজ কী করে নিয়ে যাব নৌকা?

খাল কেটে। নৌকার নীচে থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এমন গভীর একটা খাল, যাতে জোয়ারের সময় জল আসবে। সেই খালও আমি কাটলাম। কাটতে সময় লাগল দুই বৎসর। অবশেষে সেই খাল দিয়ে একদা ভরা জোয়ারে নৌকা আমার সমুদ্রে ভাসল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের কঠোর শ্রমে।

আমার দ্বিতীয় কৃতিত্বের কথা বলি এইবার। এ দ্বীপে গম, যব, ধানের ফসল উৎপাদন করেছি আমি। মেরিয়ানা জাহাজ থেকে কতকগুলি ক্যানভাসের থলি এনেছিলাম। বারুদ ভরে রাখব বলে। গুহায় বসে থলিগুলি ঝাড়ছি, একটার ভিতর থেকে ঝরে পড়ল ঐ সব ফসলের বীজ কতকগুলি, সব এক সাথে মেশানো। মনে পড়ে গেল, মেরিয়ানা যখন ওরিনোকো থেকে ছাড়ে, তখন আমাদের সঙ্গে ছিল কতকগুলি জ্যান্ত হাঁস মুরগী। ওদের সঙ্গে নিয়েছিলাম, কিছু-দিন অন্ততঃ টাটকা ডিম এবং মাংস খাব বলে। ঝড়ের তাড়ায় উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রে গিয়ে পড়ার আগেই পাখিগুলো খেয়ে শেষ করেছিলাম আমরা। তাদের খাওয়াবার জন্য যে সব শস্য আনা হয়েছিল, তার কিন্তু কয়েক মুঠি রয়ে গিয়েছিল তখনো।

এ বীজ কোন কাজে আসবে, এমন আশা আমি করিনি। গুহা থেকে মুঠি করে করে বাইরের উঠোনে এনে ফেলে দিয়েছিলাম। তারপর আর মনেই ছিল না ওর কথা। মনে পড়ল দীর্ঘ ছয় মাস পরে।

বর্ষা পড়তেই সেই বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়ে উঠল, আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম উঠোনের এক প্রান্তে ধান, গম, যবের কতকগুলো গাছ একসঙ্গে গজিয়ে উঠতে দেখে।

সেসব গাছ ফসল দিল কিছু। আমি সব ফসল তুলে রাখলাম বীজ হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য। পরবর্তী বর্ষায় বুনে দিলাম সবগুলি। এবারে মাটি কুপিয়ে, বেড়া দিয়ে ঘিরে। এবারে ফসল উঠল কয়েক ঝুড়ি। এবারও আমি খাদ্য হিসেবে সে শস্যের এক কণাও নিলাম না, সব বুনে দিলাম, অনেক বেশী জমি কুপিয়ে।

এইভাবে চার বৎসরের চেষ্টায় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ যা দাঁড়াল, তাতে দেখলাম যে বীজশস্য তুলে রেখেও হপ্তায় অন্ততঃ দুইদিন খোরাকির ব্যবস্থা আমার হয়ে গিয়েছে।

আজ এই নির্বাসন জীবনের সাতাশ বছর যখন পেরুচ্ছে, তখন ত সারা বছর দৈনন্দিন তিনবার আহারের মত ফসল আমার ঘরে মজুদ।

সাত

সাতাশ বছর কেটে গিয়েছে এই দ্বীপে। এর মধ্যে রোমাঞ্চকর ঘটনা কিছু ঘটেছে বলে ত মনে পড়ে না। আমার একঘেয়ে জীবন-যাত্রার সাময়িক ওলটপালটও যে কোনদিন কোন কারণে হয়েছে, স্মরণ করতে পারি না এমন কথাও।

এইবার কিন্তু ঘটল একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা। আমার মসৃণ জীবনধারায় একটা আবর্ত সৃষ্টি হল অকস্মাৎ।

ডিমের লোভে কচ্ছপের খোঁজ করতে গেছি উত্তর উপকূলে। আমার গুহার কাছে ও-প্রাণীটার দেখা পাই কদাচিৎ, কারণ সমুদ্র থেকে সোজা ওখানে উঠবার কোন পথ নেই, উঠতে হলে খালের ভিতর ঢুকে সেইখানে পৌঁছোতে হয়, যেখানটাতে বাঁধা রয়েছে আমার ভেলা। যে কারণেই হোক, কচ্ছপেরা যায় না সে-খালের ভিতরে। উত্তর উপকূলে পাহাড় নেই, সেইখান দিয়ে ডাঙ্গায় ওঠাই সুবিধা ওদের।

ঐ যায় এক বিশাল কচ্ছপ। হাতের লাঠিখানা বাগিয়ে ধরে আমি ছুটলাম তার পানে। আর আধাআধি পথ যাওয়ার পরেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। ঠিক বজ্রাহতের মতই নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়াতে হল আমায়। যা সাতাশ বৎসর দেখি নি, এ-দ্বীপে থাকতে যা দেখবার আশাও করি নি, সেই জিনিসই ঠিক আমার সমুখে।

একটা পদচিহ্ন। মানুষের পায়ের দাগ।

মাঠখানা ঘাসে ঢাকা। কেবল একটা জায়গায় দুই ফুটের মত জমির ঘাস কে জানে কী-কারণে মরে নির্মূল হয়ে গিয়েছে। ঠিক সেই অনাবৃত মাটিটুকুর উপরেই ঐ পায়ের দাগটা। কাল বৃষ্টি হয়েছিল একটু, মাটি নরম আছে এখনও। হয় কাল, নয় আজই

কোন মানুষ হেঁটে গিয়েছে এই ঘাসে-ঢাকা মাটির উপর দিয়ে। যেখানে ঘাস, সেখানে দাগ পড়ে নি, এই একটা জায়গায় পড়েছে, কারণ ঘাস নেই এখানে।

কতক্ষণ বেহুঁশের মত নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিলাম ঐ পদ-চিহ্নের দিকে, তা বলতে পারি না। যখন বিচারবুদ্ধি ফিরে এল, তখন একবার তাকালাম নিজের পায়ের দিকে, আর একবার তাকালাম ঐ দাগের দিকে। হাসি পেলো নিজের বোকামি দেখে। আমার পদচিহ্ন ওটা হতেই পারে না। ও চিহ্ন ত নগ্ন পদের! অথচ আমার পায়ে—

না, জুতো নয়। জুতো নেই আজ বহুকাল। তবে আমার পা একেবারে খালিও নয় তা বলে। ছাগলের চামড়ার একটা টুকরোর সঙ্গে ফিতে জুড়ে নিয়েছি আমি, যা তৈরী হয়েছে, তা চপ্পলের মতই জিনিস একটা। আমার পায়ের তলায় তাই বাঁধা থাকে সর্বদা। হেঁটে গেলে গোড়ালির বা পদাঙ্গুলির দাগ পড়ে না—

অথচ ঐ যে পায়ের দাগ, ওতে ত পাঁচ পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ গভীর হয়ে বসে গিয়েছে ভিজে মাটিতে! না, আমার পা নয় ও। অন্য কারও।

কে হতে পারে সে অন্য লোক? এ দ্বীপে আমি ছাড়া মানুষ নেই আর। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি সারা দ্বীপটা, মানুষ দেখি নি, মনুষ্য বসতির কোন চিহ্নই দেখি নি। তবে আজ ও পদচিহ্ন কোথা থেকে আসে?

অনিবার্য সিদ্ধান্ত—অন্য কোন দ্বীপের লোক কাল অপরাহ্ণে এসেছিল এ দ্বীপে। ঐ যে দিগন্ত সীমায় কালো কালো দাগ দেখতে পাই দূরবীন চোখে তুললে, ওগুলো হয়ত দ্বীপও হতে পারে, এমন একটা সন্দেহ আমার মনে চিরদিনই ছিল। সে সন্দেহের ভিত্তি কতদূর কী আছে, তাই যাচাই করবার জন্যই কয়েক বছর এক-টানা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে নৌকা তৈরি করেছি আমি। কিন্তু

যাচাই করবার জন্য আমাকে আর সমুদ্রযাত্রা করতে হল না, অযাচিত ভাবে প্রমাণ এসে গেল আমার চোখের সামনেই। দিগন্ত-লীন ঐ কালো দাগগুলি হল অজানা সব দেশ, এবং সেসব দেশে মানুষও বাস করে। সেই সব দেশেরই এক বা একাধিক মানুষ কাল এখানে এসেছিল প্রমোদ-ভ্রমণে।

এমন তারা প্রায়ই আসে নাকি? আসেই যদি, তা হলে দীর্ঘ সাতাশ বছরেও তাদের কোন আভাস পাই নি কেন?

কচ্ছপ শিকারের চিন্তা আর আমার মাথায় নেই। ঐ যে সে কচ্ছপ এখনও বেশী দূরে যেতে পারে নি। কিন্তু ওর দিকে আর ফিরেও তাকালাম না আমি। বেত্রাহত কুকুরের মত ছুটে পালিয়ে গেলাম। বনসীমা বেশী দূরে নয়। সেই বনে ঢুকে একটা খুব উঁচু ডালে চেপে বসলাম পাতালতার আড়ালে। সেইখান থেকে চার-দিকে নজর দিতে থাকলাম অনেকক্ষণ ধরে। যা খুঁজছি, তা দেখতে পাচ্ছি না।

আগন্তুকেরা হয়ত নৌকা খুলে স্বস্থানে প্রস্থান করেছে। দূর-বীনটাও এ সময়ে সঙ্গে নেই। থাকলে একবার দূর সমুদ্রের উপর দিয়ে তা ঘুরিয়ে আনতাম।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। প্রস্থান যদি করে থাকে, আপাততঃ রেহাই আমার। কিন্তু যদি না করে থাকে প্রস্থান? এমন যদি হয় যে এই বনের ভিতরই তারা লুকিয়ে আছে এই মুহূর্তে? এমন যদি হয় যে তারা আমার অস্তিত্বের কথা জানতে পেরেছে কোনরকমে, এবং আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে বনবাদাড় ঘুরে ঘুরে?

যারা এসেছে, অবশ্যই দল বেঁধে এসেছে তারা। বন্দুক তাদের নেই হয়ত, সেদিক দিয়ে আমি খানিকটা সুবিধা পাব লড়াইয়ে। কিন্তু সুবিধা পেতে হলে আগে আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে হয়। সুরক্ষিত গৃহে আত্মগোপন করে আড়াল থেকে গুলি চালাতে হয়। এই খোলা মাঠে বা নিবিড় বনে ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়

যদি, সমূহ বিপদ তাতে। আমার সঙ্গে এখন বন্দুক নেই, অথচ ওদের সঙ্গে তীরধনুক আর বল্লম আছে নিশ্চয়। আমি একা, ওরা অনেক। একান্তই অসম যুদ্ধ। অতএব এক্ষুণি আমার পালানো দরকার। যেমন চিন্তা, তেমনি কাজ। বনের ভিতর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম আমি। সোজা আমার গুহাগৃহে। এটা আমার তিন বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে সুরক্ষিত, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমুদ্র থেকে এটাই আমার সবচেয়ে নিকটে। কে জানে ওদের নৌকার বহর এই মুহূর্তে খালের মুখেই এসে আড্ডা গাড়ে নি? কে জানে কূলে উঠে ওরা এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে আমারই বাড়ির সন্ধান পাবে না? বাড়ির বাইরেটা দুর্ভেদ্য বৃক্ষপ্রাচীরে বেষ্টিত। সেই প্রাচীর দেখেই ওরা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে নিশ্চয়। স্বাভাবিক ভাবে গাছের গায়ে গাছ ওভাবে গজায় না সারি বেঁধে। সন্দেহ যদি হয়, ওরা গাছের বেড়া কেটেও ভিতরে ঢুকবে।

না, এখানে নয়। এখানে থাকা নিরাপদ হবে না। আমি আমার পুব-পাড়ার বাড়িতে ছুটলাম। খাল যেখানে শেষ হয়েছে, তারই কাছাকাছি এ-বাড়ি। এখানেও বসবাসের সব ব্যবস্থা রয়েছে। আর সবচেয়ে ভরসার কথা, শত্রু সমুদ্র থেকে কখনোই অত দূরে যাবে না। কারণ, যাওয়ার দরকার ত নেই বটেই, তার উপরে আবার নৌকা অরক্ষিত রেখে নিশ্চয়ই ওরা ডাঙ্গাপথে ধাওয়া করবে না অজানাকে জানবার নেশায়।

আমি এই বাড়িতে ঢুকেই ধপ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মেরিয়ানা জাহাজ থেকে তিন প্রস্থ শয্যাদ্রব্য এনেছিলাম, এক এক বাড়িতে এক এক প্রস্থ রেখেছি। বিছানা পাতাই থাকে। যখন আসি, একটু ঝেড়ে নিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি। আজও তাই করলাম। এমন প্রচণ্ড উত্তেজনায় পেয়ে বসেছিল আমাকে যে শোয়া মাত্র আমি অচৈতন্য হয়ে গেলাম। আর সেই অচৈতন্য অবস্থার মধ্যেই প্রবল জ্বর এসে আক্রমণ করল আমাকে।

সে জ্বর যে ঠিক কয়দিন আমাকে অজ্ঞান করে রেখেছিল, তার সঠিক হিসেব আমার নেই। হুঁশ হল অবশেষে একটা কণ্ঠস্বর শুনে। ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি। জনমানব নেই এখানে আমি ছাড়া। অসভ্যেরাও যদি এসে থাকে এতদূর, তারা ইংরেজীতে কথা কইবে কেমন করে? এ যে স্পষ্ট ইংরেজী জবান! "রবিন ক্রুসো, কী হয়েছে তোমার? আহাহা, বেচারী রবিন ক্রুসো, কোথায় কোথায় গিয়েছিলে তুমি? এ হাল কেন তোমার?"

সে কণ্ঠ ক্রমাগত ঐ কয়েকটি প্রশ্নই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করে যাচ্ছে—কী হয়েছে তোমার? কোথায় গিয়েছিলে তুমি? এ হাল কেন তোমার? বারবার শুনতে শুনতে জ্বরক্লিষ্ট মগজেও আসল তথ্যটা একসময়ে ধরা পড়ল আমার। কয়েক বৎসর আগে একটা ময়না পাখি ধরেছিলাম আমি, পোষও মানিয়ে ছিলাম। আমিই তাকে ক্রমে ক্রমে ঐ কথাগুলি আওড়াতে শিখিয়েছি। আমি যখন যে বাড়িতে থাকি, ও আমার সঙ্গে থাকে। সেদিন গুহাগৃহ থেকে যখন আমি ভয়ে ভয়ে পালিয়ে এলাম, পলিও এল উড়তে উড়তে। আমি তা লক্ষ্য করি নি। সেই থেকেই কিন্তু ও আমার শয্যাপার্শ্বে রয়েছে, আর মাঝে মাঝে হেঁকে যাচ্ছে "রবিন ক্রুসো! আহা বেচারী রবিন ক্রুসো! এ-হাল কেন তোমার? কী হয়েছে তোমার? কোথায় কোথায় গিয়েছিলে তুমি রবিন ক্রুসো?" জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান ছিলাম, আমি সে ডাকাডাকি শুনতে পাই নি। আজ শুনতে পেয়ে হাত বাড়িয়ে ময়নাকে টেনে আনলাম কাছে। এ দুঃসময়ে পাখির অভ্যাসমত কপচানির মধ্যেও কত যেন দরদের স্বাদ পেলাম আমি। চোখ ভরে জল এল আমার। বিপদ আর অসুস্থতার মুহূর্তে মনটা যে বড় বেশী সহানুভূতির কাঙ্গাল হয়ে পড়ে!

পলিই নির্বাসন জীবনে এখন একমাত্র সঙ্গী আমার। কুকুর জিম মরে গিয়েছে অতিরিক্ত বার্ধক্যের দরুন। দুটো বেড়াল

এনেছিলাম জাহাজ থেকে, তারা আর বেঁচে নেই। তাদের কাচ্চা বাচ্চা বহু বহু আছে। কিন্তু সেগুলো শেষদিকে এত বেশী উৎপাত করত যে তাদের আমি জঙ্গলে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাই বলছি, জীবিত প্রাণী বলতে একমাত্র সাথী আমার এই ময়নাটাই আছে এখন।

ক্রমে একটু বল পেলাম দেহে। উঠে গিয়ে দুটো ছাগী দোহন করে দুধ খেলাম খানিকটা। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লাম পলিকে কাছে নিয়ে।

দুই দিন পরে আমি আগের মতই সুস্থ সবল। এইবার বেরুলাম আগন্তুক বর্বরদের খোঁজে। তারা কি চলে গিয়েছে, না এখনও বসে আছে আমার রাজ্যে? কী করতে এসেছিল? কী করে গেল? বা কী করার চেষ্টায় রয়েছে? পরিস্থিতিটা স্পষ্ট বুঝতে না পারলে ত এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পাব না আর! আমি বিপদের মধ্যেই আছি, না বিপদ কাটিয়ে উঠেছি? বিপদের সঙ্গে লড়ব প্রয়োজন হলে। আপাততঃ সে বিপদ যদি কেটেও গিয়ে থাকে, ভবিষ্যতে অনুরূপ বিপদের মোকাবিলা করার জন্য তৈরী থাকতে হবে। যা-কিছুই করি, আগে সরেজমিনে তদন্ত করে আসা দরকার।

প্রথমে গেলাম গুহাগৃহে। সেখানে সবই ঠিক আছে। আগন্তুকেরা সেখানে আসে নি। একদম না। কাজেই বাড়িতে আর ঢুকলাম না। সোজা চলে গেলাম সেইদিকে, যেখানে পদচিহ্ন দেখেছিলাম সেদিন। এবারে আর নিরস্ত্র নই। দুটো বন্দুক দুই কাঁধে, দুটো পিস্তল কোমরবন্ধে, তা ছাড়া টোটাবারুদ ভরতি একটা ব্যাগ। উপরন্তু লম্বা একখানা তরোয়ালও ঝুলছে সেই কোমরবন্ধ থেকে।

সেই পদচিহ্ন এখনও অটুট। স্বপ্ন দেখেছিলাম বা ভুল দেখেছিলাম বলে মনকে প্রবোধ দেওয়ার কোন উপায় নেই। ভেবে দেখলাম, পায়ের আঙ্গুলগুলো বনমুখো নয়। লোকটার গতি যেন ছিল দ্বীপের

উত্তর-পুব কোণের দিকে। সেদিকেই কি গেল নাকি ওরা? কী মুশকিল! বহু-মেহনতে যে নৌকাটা গড়েছি, সেটা যে ঐদিকেই জলে ভাসানো রয়েছে! ঠিক সমুদ্রজলে নয়। আগেই বলেছি যে বন থেকে সমুদ্র পর্যন্ত একটা খাল আমাকে কাটতে হয়েছিল নৌকা ভাসাবার জন্য। সেই খালের মধ্যেই রয়েছে নৌকা। খোঁজাখুঁজি না করলে দেখতে পাবে না কেউ। কিন্তু বরাত যদি মন্দ হয় আমার, কী না হতে পারে?

যা হোক, নৌকার উদ্দেশেই রওনা হলাম আমি।

কী স্বস্তি! নৌকা আমার নিরাপদেই আছে। অসভ্যেরা এদিকে এসেও থাকে যদি, নৌকাখানা দেখতে পায় নি। পেলে কি আর ফেলে রেখে যেত?

কিন্তু আসল প্রশ্নের সমাধান ত হল না আমার! এদিকে যদি শত্রুরা না এসে থাকে, গেল কোন্ দিকে? নৌকার উদ্দেশে হেঁটে-ছিলাম বনের ভিতর দিয়ে। এখন মনে কী জানি কেন সাহস এসেছে একটু। ফেরার সময় আমি বনপথ ধরলাম না আর, হাঁটতে লাগলাম সমুদ্রকূল ধরে। অর্থাৎ উত্তর-পুব কোণ থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে।

বেশী দূর যেতে হল না। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, এক বিভীষিকা দেখে। কূলের উপরে একটুখানি বেলাভূমি আছে এখানে, দুপুর রোদে ঝকঝক করছে সাদা বালি। সেই বালির উপরে বিরাট ছাইগাদা একটা, তার চারদিকে ছড়ানো দগ্ধাবশেষ কাঠখুটো অনেকগুলি, আর—

আর—মানুষের হাড়গোড় অনেক—অনেক। বহুদিনের পুরোনো হাড়গোড় নয়, সদ্য নিহত মানুষের তাজা হাড়! টুকরো টুকরো হাতে পায়ে চামড়া লেগে আছে এখনো, মাথার খুলিতে চুল, সে চুলে রক্ত মাখানো। এ-রকম মাথা গুনলাম পাঁচটা।

তা ছাড়া পোড়া মাংসের ছড়াছড়ি অনেকখানি জায়গা জুড়ে।



আমার অদ্ভুত চেহারা দেখে পাথরের মূর্তির মত আড়ষ্ট হয়ে গেল। [পৃঃ ১০৩

পাষণ্ড নরখাদকদের পৈশাচিক ভোজের শেষে উদ্বৃত্ত পোড়া মাংস এখানেই ফেলে রেখে গিয়েছে তারা। এদেশটায় বনে নেই শেয়াল, আকাশে নেই শকুন। যেমন ফেলে গিয়েছিল, তেমনি পড়ে আছে।

হতবুদ্ধির মত অনেকক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে রইলাম সেই শ্মশান বেলাভূমিতে। ক্রমে আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করতে লাগলাম আমি। সাম্প্রতিক এই ভোজ ছাড়াও আগের অনেক ভোজের নিদর্শন দূরে দূরে ছড়ানো রয়েছে। আগুন জ্বলেছিল কোন এক দিন, ছাইয়ের গাদা আর নেই। কিন্তু বালির সঙ্গে কালো আঙ্গরা মিশে আছে, স্পষ্টই দেখা যায়। অনেক হাড় পড়ে আছে, মাথায় হাড্ডিসার খুলিও তুই একটা, তাতে চামড়া বা চুল কিছুই আর লেগে নেই। অর্থাৎ সেসব বহুদিনের পুরোনো জিনিস।

এতে করে কী বুঝব আমি? অবশ্য এই কথাই বুঝব যে এ দ্বীপে মাঝে মাঝেই যাতায়াত আছে নরখাদকদের। এখানে তারা আসে জ্যান্ত মানুষ নিয়ে। হয়ত সেসব মানুষ যুদ্ধবন্দী। তাদের আনে এখানে, মাথায় ডাঙ্গশ মেরে হত্যা করে তাদের, তারপর আগুনে পুড়িয়ে বসে বসে খায় উদর পূর্ণ করে। অবশ্যই পুরুষানুক্রমে তারা আসছে এখানে। আমি যে এই সাতাশ বৎসরের মধ্যে তাদের এই যাতা-য়াতের কথা জানতে পারি নি, সে আমার খুব জোর বরাত ছিল বলেই। হাজার তুঃখ অভাব অনটনের মধ্যেও আমি যে এই নিঃসঙ্গ নির্বাসনে শান্তির জীবন যাপন করতে পেরেছি, তা তাদের অস্তিত্ব বিষয়ে আমার কিছু না-জানা থাকারই দরুন। দীর্ঘযুগ ধরে অবিরাম যদি "এই এলো, এই ধরলো" বলে মনের কোণে নিদারুণ একটা আশঙ্কা পুষে রাখতে হত, সে যে আমার হত নরক যন্ত্রণারই শামিল!

সে নরক-যন্ত্রণা এই মুহূর্তে হচ্ছে। প্রতি ঝোপের ভিতর অদৃশ্য শত্রুর উপস্থিতি কল্পনা করে আঁতকে উঠছি। গাছের পাতার ফাঁকে রৌদ্ররশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাকে ভাবছি বল্লমের ঝকঝকে ফলা। এক পা এগুচ্ছি, আর চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করছি। এর চেয়ে

শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হওয়াও বুঝি ভাল। তাতে দুই মিনিটে সব সন্দেহের নিরসন হয়ে যায়। হয় এস্পার, নয়ত ওস্পার।

যা হোক, বাড়ি ফিরে এলাম। নিজেকে বোঝালাম যে অস্থির হয়ে লাভ নেই। ভাগ্যে যা আছে, তা হবে। সাতাশ বছর আগেই ত আমি মরতে পারতাম জাহাজডুবি হয়ে। তা যখন মরি নি, এখনও না মরতে পারি। তবে একটা সংকল্প করেছি, বন্দুক পিস্তল সঙ্গে না নিয়ে গুহা থেকে বেরুবো না। আর শত্রুর সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত লড়াই করব তাদের সঙ্গে। অর্থাৎ শেষ গুলিটা খরচ হওয়ার আগে পর্যন্ত। শেষ গুলিটা দিয়ে শত্রুবধ করব না, করব আত্মহত্যা। জ্যান্ত থাকতে ওদের হাতে ধরা দেব না। মাথায় ডাঙ্গস মারবে ওরা, তারপর প্রাণটা বেরিয়ে যাওয়ার আগেই হাত পা গুলো কেটে কেটে আগুনে ছুড়ে দেবে ঝলসাবার জন্য, এটা হতে দেব না।

সেইদিনই বিকালে উঠল প্রলয় ঝড়। সারা রাত চলল তার তাণ্ডব। অবশ্য ঝড়বৃষ্টি আমার গা সওয়া আছে। ওতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। আমার এ গুহাতে প্রকৃতির দুর্যোগ হানা দিতে পারে না। বাইরের তাঁবুটা অবশ্য খানিক-খানিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তা দুর্যোগ কেটে না গেলে ত আর আমি তা টের পাই না!

হ্যাঁ, প্রচণ্ড ঝড়ই চলল সারারাত, থামল পরের দিন সকালে। আমি তখন বেরুলাম একবার। কোথায় কী ক্ষতি হল, দেখা দরকার। এ রকম অবস্থায় আমি সোজা বেরিয়ে যাই গুহার পিছনের দরজা দিয়ে। সেখান থেকে পাহাড়ে উঠে যাই। খাড়া পাহাড়ে ওঠার জন্য আমি তার গায়ে গায়ে খাঁজ কেটে রেখেছি। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মতই তড়বড় করে উঠে পড়ি চূড়ায়। সেখানে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীন কষলে চারিদিকে জল স্থল আকাশ সবই দেখতে পাই। আজ যা দেখলাম, তা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি মর্মান্তিক।

দূরবীন চোখে লাগাতেই প্রথম চোখে পড়ল—উত্তর পশ্চিমে দূর

সমুদ্রে একখানা জাহাজ। বুকের ভিতর আছাড় খেয়ে পড়ল এক ঝলক রক্ত। তবে কি মুক্তি এল? এই দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে? কিন্তু সে উত্তেজনা পরের মুহূর্তেই ঝিমিয়ে পড়ল। দারুণ অবসাদে হতাশায় মুষড়ে পড়ল অন্তর। ও জাহাজ আর এক ইঞ্চিও চলবে না সমুদ্রবক্ষে। যেভাবে কাত হয়ে পড়েছে, অথচ ডুবছে না, তাতে এইখানে দাঁড়িয়েই আমি বুঝতে পারছি—চোরা পাহাড়ের মাথায় আটকে পড়েছে অভাগা জাহাজ, যেমন একদিন পড়েছিল আমাদের মেরিয়ানা জাহাজ এই দ্বীপেরই অপর দিকে।

দূরবীনটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জাহাজের প্রতি অংশ তন্ন তন্ন করে লক্ষ্য করছি। মানুষ একটাও দেখতে পাচ্ছি না। এর কারণ একটাই হতে পারে, নাবিকেরা জাহাজ ত্যাগ করে নৌকা আশ্রয় করেছে, যেমন একদিন আমরা করেছিলাম, মেরিয়ানার মতিচ্ছন্ন নাবিকেরা। হয়ত আমাদের নৌকার মত ওদের নৌকাও উলটেছে বা ডুবে গিয়েছে ঝড়ের তাণ্ডবে। তা না হলে দূর বা অদূর সমুদ্রে কোথাও সে নৌকা দেখতে পাচ্ছি না কেন?

নৌকা যদি মারা গিয়ে থাকে, নাবিকগুলোও অবশ্য মরেছে বা মরবে। এমনটা হওয়াও সম্ভব যে মজ্জনোন্মুখ কোনও অভাগা নাবিক এখনও হাবুডুবু খেতে খেতে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে প্রাণপণে। যাব নাকি? এগিয়ে যাব নাকি তার সাহায্যে? একটাও প্রাণ যদি রক্ষা করতে পারি, সে কি কম কথা? ভগবানের করুণা যদি সে অভাগ্যের উপর আমার মাধ্যমেই বর্ষিত হয়, আমি ত ধন্য হয়ে যাই!

নরখাদকের ভয় এখন অনেকটা কম। তাদের যাতায়াত নৌকা-পথে। কাজেই ঝড়ের সম্ভাবনা দেখে আগেভাগেই হয়ত তারা নিজেদের উপকূলে পালিয়েছে। সমুদ্রে তাদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে, এমন মনে করি না। আর তা যদি হয়েও যায়, আমি তাদের বেকায়দায় ফেলতে পারব। দূর থেকে এক এক গুলিতে তাদের

এক একটা নৌকা পারব ডুবিয়ে দিতে। বন্দুক ত থাকবেই আমার কাঁধে।

নৌকা আমার আছে। দীর্ঘ পাঁচ বছরের মেহনতে একার চেষ্টায় গড়েছি ঐ নৌকা। সার্থক হয়েছে সে মেহনত। আজ সেই নৌকায় চেপেই আমি ঐ ভাঙ্গা জাহাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সমুদ্র এখন শান্ত, কিন্তু দুশ্চিন্তা হচ্ছে সামুদ্রিক স্রোতের জন্য। একটা বহির্মুখী স্রোত যে এই দ্বীপেরই পাশ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বাহির সমুদ্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে বারো মাস, তা আমি দূরবীনের সাহায্যে অনেকদিন আগেই লক্ষ্য করেছি। সে স্রোতের কবলে পড়ে গেলে আমার নৌকা এক দিনে হাজার মাইল দূরে গিয়ে পড়বে। গায়ের জোরে নৌকাকে সে স্রোতের গ্রাস থেকে বার করে আনা অসাধ্য।

যা হোক, সে স্রোতের গতিপথ আমি জানি। সযত্নে তাকে এড়িয়ে আমি অন্য পথ ধরলাম ভাঙ্গা জাহাজে পৌঁছোবার জন্য। বেশী দূর ত নয়, মাইল দুইয়ের মধ্যেই আছে ওটা। আমি নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেলাম এক ঘণ্টার মধ্যে।

পাহাড়ের মাথা থেকে যা দেখেছিলাম, কাছে এসেও তাই। জীবন্ত মানুষ একটিও নেই জাহাজে। তবে একটা কামরার মধ্যে দুটো মৃতদেহ দেখতে পেলাম। নাবিক ছিল দু'জনেই। ঘরের দরজা কেমন করে না জানি বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারা আর বেরুতে পারে নি। ঘরে জল ঢুকে তাদের শ্বাসরোধ করে মেরেছিল। এখন অবশ্য সে জল নেমে গিয়েছে আবার।

জাহাজে উঠে যথাসম্ভব খুঁজলাম তন্ন তন্ন করে। কেউ নেই! নিশ্চয়ই আমার অনুমানই ঠিক। আরোহীরা পালিয়েছে নৌকায় চড়ে। নৌকা সমেত তারা কি ডুবেই মরল, না উঠল গিয়ে কাছাকাছি কোন নরখাদকের দ্বীপে, তা জানবার কোন উপায় নেই। উঠেও যদি থাকে ডাঙ্গায়, তাতেও পরিণামে মৃত্যু। আরো অনেক

বেশী যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। মাথায় ডাঙ্গশ মারবে, হাত-পা ছিঁড়ে ছিঁড়ে আগুনে ঝলসাবে, হয়ত তাদের হুঁশ থাকতে থাকতেই, তাদের চোখের সামনেই, তাদেরই আধপোড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গপগপ করে গিলবে—হে ভগবান, তেমন পরিণাম যেন পরম শক্রুরও না হয়!

আমি যা পারলাম, কিছু কিছু জিনিস নৌকায় তুললাম। এ ত এখন বেওয়ারিস মাল। আমি যদি না নিই, সমুদ্রের গ্রাসে যাবে। খাদ্যদ্রব্য, রুটি ময়দা পনির চিনি নিলাম কিছু, দুই পিপে রম, টোটা বারুদ দুই পেটি আর দুই বাক্স নাবিকের পোষাক। এক জোড়া জুতো পেয়ে গেলাম প্রায় নতুন। এইটিই আমায় আনন্দ দিল খুব। আজ বহু বৎসর ত পায়ে আস্ত চামড়া বেঁধে বেড়াচ্ছি ছাগলের।

পেয়ে গেলাম আর একটা জিনিস। এক গাদা স্পেনিশ মোহর। কাপ্তেনের ঘরে ছিল একটা বাক্সে। প্রথমে ভাবলাম নেব না। মেরিয়ানা থেকেও এনেছিলাম কিছু। তাতে এখন মরচে পড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। আবার সেই জিনিসই আরও এক গাদা নিয়ে গিয়ে করব কী? কিন্তু তারপরই কেমন খেয়াল হল, একটা বস্তায় পুরে নিয়ে নিলাম মোহরগুলো। ভগবানের ইশারা ছাড়া আর কী! আমি না জানি, তিনি ত জানতেন যে ভবিষ্যতে ওগুলি কত কাজ দেবে আমার!

ছোট নৌকা, বেশী বোঝাই নেবার উপায় ছিল না। আমি ফিরে এলাম ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। ভারাক্রান্ত, নিরুদ্দেশ নাবিকদের কথা চিন্তা করে।

আরও দুই একবার ঐ জাহাজে যাওয়ার আমার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তা আর হয় নি। সেই রাত্রেই আবার ঝড় হল, পরদিন সকালে দূরবীন দিয়ে দেখলাম, "হিসপ্যানিওলা" জাহাজের চিহ্ন নেই কোথাও।

আট

তার পরেও ছয় মাস কেটে গিয়েছে। নরখাদকদের নতুন কোন আভাস আর পাই নি এর ভিতর। তবু আমি হুঁশিয়ার আছি, চোখ কান মেলে রেখেছি প্রতিনিয়ত। খোলা মাঠে পারতপক্ষে হাঁটি না, হাঁটি বনপথে। সমুদ্রের ধারে বা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়াই না, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা উপভোগের জন্য। ও-রকম দাঁড়ালে যে বহুদূর সমুদ্র থেকে অসভ্যদের দৃষ্টিপথে পড়ে যেতে পারি, সে বিষয়ে আমি পুরোমাত্রায় সচেতন।

হ্যাঁ, ছয় মাস কেটে গেল, নতুন কোন ঘটনা ঘটল না। তারপর কালচক্র আবর্তিত হতে লাগল দ্রুতবেগে আবার। একদিন সকালে পাহাড়ের উপরে উঠতেই উত্তর উপকূলে এক জায়গায় দেখলাম—একসাথে তিনখানা নৌকা। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নৌকাগুলির যে আয়তন, তাতে অনুমান হল—প্রতি নৌকায় দশটা মানুষ অনায়াসে বসতে পারে। তা যদি পারে, তা হলে ত ধরে নিতে হবে—এবারে আমার অতিথিরা দলে বেশ ভারী, কমবেশী ত্রিশ জনের মত!

কিন্তু তারা গেল কোথায়? একজনকেও ধারে কাছে দেখতে পাচ্ছি না! আমি আর পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ মনে করলাম না, শুয়ে পড়লাম উপুড় হয়ে। তারপর বুকে হেঁটে হেঁটে চলে এলাম একেবারে কিনারার কাছে। সেইখান থেকে উপত্যকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম দূরবীনের ভিতর দিয়ে। নাঃ, কোনদিকেই নেই ওরা!

কিন্তু কোন এক জায়গায় তারা থাকবে ত নিশ্চয়ই! চট্ করে মনে পড়ে গেল উত্তর-পুব কোণের সেই বধ্যভূমি তথা ভোজমণ্ডপের কথা। যেখানে আগে একদিন ছাইগাদা আর নরদেহের টুকরো

টুকরো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখেছিলাম আমি। ওরা কি তাহলে সেইখানেই গেল? আবার কি তাহলে ভোজ হবে ওদের আজ?

সেবার একটা পায়ের দাগ দেখেই আমি ছুটে পালিয়েছিলাম। ভয়ে অজ্ঞান হয়ে ছিলাম তিন দিন। এবার কিন্তু পালিয়ে থাকার কথা মগজেই এলো না আমার। পুরোনো হয়ে গেলে ভয়ংকরও আর ভয়ের উদ্রেক করতে পারে না বোধ হয়। আমি মনস্থ করলাম, পাহাড় থেকে নেমে উত্তর-পুবের সেই বেলাভূমিতে যাব। না, ওদের পৈশাচিক কাণ্ডকারখানা দেখবার জন্য নয়। ওতে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। মনে খুব সন্দেহ আছে, আধপোড়া নরমাংস ওদের যদি গবগব করে গিলতে দেখি, আমি হয়ত হড়হড় করে বমি করে ফেলব। না, ও-দৃশ্য দেখতে পেলে আমি পালাতে বাধ্য হব নিশ্চয়ই।

তবে আমি যাচ্ছি কেন?

একটা কথা মাথায় এসেছে বলেই যাচ্ছি। ভোজ খাওয়ার আগে নরহত্যা করতে হবে ওদের। সেই হত্যাটা আটকাবার চেষ্টা করতে পারি কিনা, তাই দেখবার জন্যই আমার যাওয়া। ওরা সঙ্গে এনেছে ওদের বলি। এখনও হয়ত জ্যান্তই আছে সেই বন্দী জীবটা। তাকে উদ্ধার করার কোন চেষ্টা যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয়, তা আমার করা উচিত। ন্যায়তঃ ধর্মতঃ সে-চেষ্টা করতে আমি বাধ্য। ভগবানে বিশ্বাস রাখে যারা, বাধ্য তারা প্রত্যেকেই। অন্যায়ভাবে নিহত হতে যাচ্ছে একটা লোক, তার সাহায্যে যে না অগ্রসর হবে শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও, নিশ্চয়ই সে মনুষ্যপদবাচ্য নয়। শেষ বিচারের দিনে এই কর্তব্যচ্যুতির জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে ভগবানের কাছে।

সুতরাং আমি ছুটেছি। বনপথ আমার নখদর্পণে। অত্যল্প সময়ের মধ্যেই আমি উত্তর-পুব কোণের সেই বধ্যভূমিতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। অদূরবর্তী একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে

লাগলাম সমুখের ঐ নারকীয় কাণ্ডটা। যা অনুমান করেছি, তাই বটে। ওরা এখানেই এসেছে বটে। আগুন জ্বলে উঠেছে, বিরাট এক অগ্নিকুণ্ডে। তার চারিধারে গোল হয়ে বসে আছে প্রায় ত্রিশ জন মানুষই বটে। 'প্রায়' বলতে হচ্ছে এইজন্য যে আগুনের আড়ালে ঠিক কয়জন আছে, তা গুনে উঠতে পারলাম না। চার জন হতে পারে, ছয় জন বা তারও বেশী হওয়া অসম্ভব নয়।

একটা ধড় পড়ে আছে, মানুষের ধড়। আমি আসার আগেই বলিদান হয়ে গিয়েছে এক নম্বর। নগ্ন দেহ মানুষটার। মাথাটার মাঝামাঝি ফাটা। সেখান থেকে রক্ত বেরুচ্ছে এখনও, আর বেরুচ্ছে ঘিলু। এদিকে কুড়োল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে ওরা হাত-পাগুলো কেটে বার করে নিচ্ছে ধড় থেকে। এক এক জনে এক একটা টুকরো দখল করে আগুনের উপর ধরছে ঝলসাবার জন্য। কেউ এখনও ধরেই আছে, কেউ আবার খেতেও শুরু করে দিয়েছে গোগ্রাসে। অধিকাংশই কিন্তু প্রতীক্ষায় আছে এখনও, কোন টুকরোই এখনো পৌঁছোয় নি তাদের কাছে।

পৌঁছোবেও না। ধড়টা নিঃশেষ হয়ে এসেছে প্রায়। বড় জোর আর দুই তিন জন ভোক্তাকে এটা থেকে মাংস যোগানো যেতে পারে। বাকীদের কী হবে?

সে ব্যবস্থা যে আছে ওদের, তা আমি আগে ঠাহর পাই নি। আগুনের আড়ালে আরও দুটো বলির পশু মজুদ রয়েছে,—দ্বিপদ পশু অবশ্য। তাদের আমি দেখি নি এতক্ষণ। এইবার দুই জন ভোক্তা উঠে গিয়ে তাদের একটাকে ধরে নিয়ে এল চুলের মুঠি ধরে। হাত-পা বাঁধা ছিল লোকটার, হিঁচড়েই টেনে আনল বালির উপর দিয়ে।

ঘটনা যেখানে ঘটছে, তা অবশ্যই আমার বন্দুকের পাল্লার মধ্যে। আমি কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে তাক করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল একটা ধাবমান মূর্তির দিকে। তৃতীয় বন্দীটা

কেমন-করে-যেন খুলে ফেলেছে হাত পায়ের বাঁধন, দিয়েছে চোঁচা দৌড় গভীর জঙ্গলের দিকে। একটা হল্লা উঠল সঙ্গে সঙ্গে, একদল লোক আগুনের পাশ থেকে উঠে তাকে ধরবার জন্য ছুটল। আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে তারই দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার কানে এল ভোজসভার দিক থেকে। যাঃ, পলাতককে পাকড়াবার জন্য যারা গিয়েছে, তারা যাক, বাদ বাকী সবাই এ-মৃগয়ার ফলাফল দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করে নি। হাতে আছে একটা অন্ততঃ শিকার, তার মাথায় বসিয়ে দিয়েছে মুগুরের এক ঘা। আমি তাকে রক্ষা করবার জন্য বন্দুক তুলেছিলুম, গুলি চালাবার সময় আর হল না আমার।

যা হোক, একটার ত হয়েই গেল যা হবার, এখন বাকী আছে ঐ পলাতক। সে জঙ্গলে ঢুকেছে। আমিও জঙ্গলেরই প্রান্তদেশে লুকিয়ে আছি, আমার মাত্র দশ বারো ফুট দূরে ঝোপঝাড় ভেঙে সে ছুটেছে বাঘের তাড়া-খাওয়া হরিণের মত। তার পিছনে—

আমি এক এক করে গুনে দেখলাম—তার পিছনে আটজন আততায়ী। ধরা যদি পড়ে, পলাতকের আর কোন ভরসা নেই। অবশ্য এই নিবিড় জঙ্গলের ভিতব শত্রুদের হয়ত সে ফাঁকি দিতেও পারে। আর আমিও ত আছি। আমি ত পাহাড় থেকে নেমেই এসেছিলাম, বিপন্নদের সাহায্য করবার জন্য। সে সাহায্য যদি করতে হয় ত এক্ষুণি তার সময়। এখানে আমার আর কিছু করবার নেই। একটা মানুষ ত মারা পড়েছে আমি এসে পৌঁছোবার আগেই। আর একটাও পড়ল আমার চোখের সামনেই, আমি অন্যমনস্ক ছিলাম বলে তার কোন উপকারে আসতে পারি নি। যা হবার তা হয়েও গেছে, এখন এই শেষ লোকটাকে বাঁচাবার জন্য একটা চেষ্টা অবশ্যই করব।

সুতরাং আমিও ছুটলাম।

অরণ্য বল, উপকূল বল, সব আমার জানা। যেদিক লক্ষ্য করে

পলাতক ছুটেছে, সেদিকে আন্দাজ আধ মাইল দূরে একটা গভীর খাল আছে। গভীর কিন্তু অপ্রশস্ত। সেই খালের ধারে গিয়ে আমি যদি আগে থাকতে ঘাঁটি আগলে থাকি, পলাতককে সাহায্য করার বা তার শত্রুদের বাধা দেওয়ার পক্ষে খুবই সুবিধা হবে আমার। আর সেই খালের ধারে পৌঁছোবার সংক্ষেপ পথও আছে কোনাকুনি ভাবে। সেটা বুনো ছাগলদেরই চলাচলের পথ, আমি তা ব্যবহার করি খুব কদাচিৎ। আজ আমি সেই পথ ধরলাম।

ওদের আগেই আমি পৌঁছে গেলাম। অপেক্ষা করছি, এমন সময় ছুটতে ছুটতে এল ওরা। পলাতক বন্দী এখনও বিশ পঁচিশ ফুট এগিয়ে আছে, খালের ধারে এসে সে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে লাফিয়ে পড়ল জলে। দেখলাম সাঁতার দিতে সে দক্ষ।

আরও দেখলাম, পশ্চাদ্ধাবন যারা করছিল, গোড়ায় তাদের সংখ্যা যদিও ছিল আট জন, এখন সে-সংখ্যা কমে কমে দুই জনে দাঁড়িয়েছে। বাকী ছয় জন অবশ্যই ফিরে গিয়েছে। অনিশ্চিতের পিছনে ধাওয়া কে করে, যখন নিশ্চিত ভোজে অংশ গ্রহণ করা যায় পা চালিয়ে উপকূলে পৌঁছোলেই!

পলাতক প্রায় ওপারে পৌঁছেচে সাঁতার দিয়ে, এমন সময় তার দুই শত্রু এসে দাঁড়াল খালের ধারে। ঝাঁপ দিতে তারাও উদ্যত, এমন সময়ে গর্জে উঠল আমার বন্দুক। সঙ্গে সঙ্গে একজন ধরাশায়ী! দ্বিতীয় লোকটা হকচকিয়ে গেল। একটা শব্দ সে শুনেছে, আর সে-শব্দ হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার আগেই তার সাথী মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তার ডান পিঠে একটা ফুটো, আর সে ফুটো দিয়ে একটা মোটা ধারা গড়িয়ে পড়ছে রক্তের। এ কী ব্যাপার? সে শব্দের উৎপত্তি কী থেকে, সে শব্দের সঙ্গে কী যোগাযোগ থাকতে পারে সাথীর মৃত্যুর, তা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। ঝুঁকে পড়ে সে একবার সাথীর দেহে নাড়া দিল অবশ্য, কিন্তু পরের মুহূর্তেই অর্থাৎ যেই তার মাথায় ঢুকল যে মরেই গিয়েছে সাথীটা, আগাগোড়া

ব্যাপারখানাকে ভৌতিক মনে করে সে পিছন ফিরে দিল দৌড়, উপকূলে ফিরবার জন্য।

কিন্তু সেইটি আমি হতে দিতে পারি না। ঐ লোকটা নিরাপদে ফিরুক, সাথীর অত্যাশ্চর্যভাবে আকস্মিক মৃত্যুর খবর ভোজসভার ত্রিশটা নরখাদকের কাছে সালংকারে বর্ণনা করুক, এ আমি মোটে চাই না। ও যদি সংবাদ বহন করে নিয়ে যায়, অবশ্যই গোটা দলটা ছুটে আসবে এইদিকে, তাতে ফল হবে মারাত্মক। ওরা ত মারা পড়বেই অনেকগুলো, আমিও অক্ষত না থাকতে পারি, বন্দী হয়ে উদরেও যেতে পারি ওদের। তার চেয়ে এই লোকটাকে—

ব্যাং! আর একটা আওয়াজ। এবং ঐ লোকটারও পতন।

পলাতক তখন ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে সে দেখতে পায় নি। যা দেখতে পেয়েছে, তা হল তার উভয় শত্রুরই আকস্মিক ভাবে পতন। মরে তারা গিয়েছে কিনা, সঠিক বুঝতে পারছে না দূরে দাঁড়িয়ে, কিন্তু মনে মনে অবশ্যই আশা তার যে এ জন্মের মত তাকে রেহাই দিয়ে গিয়েছে তারা। নিশ্চিত হবার জন্য সে আবার জলে নামল, সাঁতার দিয়ে আবার এল এপারে।

প্রথম শত্রু পড়ে আছে খালের কিনারেই, তাকে নাড়াচাড়া করল। তারপর বনের মধ্যে অগ্রসর হয়ে ঝুঁকে পড়ল দ্বিতীয় শত্রুর উপরে। ঠিক সেই সময়ে আমি বেরিয়ে এলাম ঝোপের আড়াল থেকে। বেশ একটু শব্দ করেই বেরিয়ে এলাম! আর সেই শব্দ শুনেই পলাতক তড়াক করে আমার দিকে ফিরল, আর আমার অদ্ভুত চেহারা দেখে পাথরের মূর্তির মত আড়ষ্ট হয়ে গেল।

আমিও তাকে দেখছি, সেও আমাকে দেখছে।

আমি দেখছি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এক যুবককে, সুগঠিত তার দেহ। পাকা জলপাইয়ের মত তার গায়ের রং, পিঠ পর্যন্ত ঝুলন্ত তার কালো চুল। বেলাভূমিতে এ চুল দেখেছিলাম ঝুটি করে মাথার উপরে বাঁধা, এখন তা এলিয়ে পড়েছে, বোধহয় দৌড়ঝাঁপের জন্যই।

ছেলেটি অবাক্ হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে আমার হাসি পেলো। আমি ত জানি, আমার বর্তমান চেহারা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখবার মতই। মাথায় ছাগলের চামড়ার লম্বা টুপি, গায়ে ছাগচর্মের জামা, পরনে ঐ একই জিনিষের পেন্টুলান, পায়ে—

না, পায়ের চেহারার কিঞ্চিৎ উন্নতি ইদানীং হয়েছে। স্পেনিশ জাহাজ থেকে পাওয়া নতুন জুতো জোড়ার দরুন সে পা'কে আর রবিন ক্রুসোর পা বলে চিনবার উপায় নেই। আমার মত একটা লোমশ ভালুকের শ্রীচরণে অমন চটকদার জুতো দেখে জুতো-জামার উপযোগিতা সম্পর্কে অচেতন এই বন্য যুবক কী ভাবল, কে জানে।

অবাক্ দৃষ্টির জায়গায় এখন কিন্তু ভয়ার্ত দৃষ্টি দেখা যাচ্ছে ক্রমে। একবার মৃতদেহ দুটোর দিকে, একবার আমার দিকে দেখছে ও। ওদের মৃত্যুর সঙ্গে আমার কোন যোগ আছে কিনা, বুঝবার চেষ্টা করছে নিঃসন্দেহে।

আমি ওর সন্দেহ নিরসনের একটা চেষ্টা করতে চাই। একবার নিজের বুকে হাত দিই, একবার বন্দুকের নলে টোকা দিই, আর একবার হাত দিয়ে দেখাই মৃতদেহ দুটোর দিকে। তবু সে কিছুই বুঝতে পারে না। আমি তখন আকাশের দিকে হাত তুলে একটা উড়ন্ত পাখির দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তারপর বন্দুক তুললাম উঁচু করে, আবারও ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম বন্দুকের দিকে। তারপর করলাম গুলি। ব্যাং করে শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে পাখিটাও ধপ করে মাটিতে পড়ল। ছেলেটা সভয়ে পিছেয়ে গেল কয়েক পা, কিন্তু তারপরেই ছুটে চলে গেল ভূপতিত পাখিটার দিকে। নেড়ে চেড়ে দেখল তাকে। একটা ফুটো আবিষ্কার করল তার দেহে। এইবার যেন প্রকৃত ঘটনা তার মগজে ঢুকতে লাগল একটু একটু করে। একবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে শত্রুদের গায়ের ফুটোর দিকে, আর একবার করে বন্দুকের দিকে। আর তারই সঙ্গে প্রশ্ন-সূচক ভ্রূ নাচানো। আমিও মাথা নেড়ে সায় দিই তাতে।

তখন সে ভয়ে ভয়ে নিজের বুকের দিকে আঙ্গুল দেখাল, তারপর বিবর্ণমুখে আঙ্গুল দেখাল বন্দুকের দিকে, আবারও ভ্রূ নাচালো তারপর। অর্থাৎ সে জানতে চায় যে তাকেও আমি মেরে ফেলতে চাই কিনা, যেমন মেরেছি তার যুগল শত্রুকে এবং নভশ্চর পাখিকে। আমি এবার জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, অনিচ্ছা জ্ঞাপন করে। ওর ভয়টা যেন কাটল একটু, কিন্তু স্বচ্ছন্দ হতেও পারল না হঠাৎ। আমায় সে অমিতশক্তিধর কিছু একটা ভেবেছে, ভূতপ্রেত বা দৈত্যদানব বা মায়াধর ডাইন। এরা ত মানুষের অনিষ্টই করে চিরকাল। আজ আমি যদি বলি যে আমি তার অনিষ্ট করব না, তবে সে-কথা সে বিশ্বাস করে কেমন করে? আমি বুঝতে পারলাম সে সুযোগ পেলেই পালাবার চেষ্টা করবে।

এবার আমি এগিয়ে গেলাম তার দিকে। সে অমনি কেঁপে উঠল ভয় পেয়ে। আমি তার ভয় ভাঙ্গাতে বদ্ধপরিকর। কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম দুই হাত দিয়ে, মাথায় মৃদু চাপড় দিতে লাগালাম আদর করে, হাসি হাসি মুখে বলতে লাগলাম বার বার—"ভয় নাই, ওরে ভয় নাই"। কথা সে অবশ্যই বুঝল না, কিন্তু হাসিটা যে অভয়সূচক, সেটুকু বুঝল অন্ততঃ। তার মুখে যেন ক্রমশঃ ফুটে উঠতে লাগল আশার আলো।

আমি তখন নিজের বুকের উপর হাত রেখে বললাম "মাস্টার"। অর্থাৎ আমি চাই যে এখন থেকে ও আমায় মাস্টার বা মালিক বলে জানুক ও ডাকুক। তারপব ওর বুকের উপর হাত রেখে বারবার বললাম "ফ্রাইডে, ফ্রাইডে, ফ্রাইডে,"—অর্থাৎ ওর নাম যে আমি ফ্রাইডে রাখলাম আজ থেকে, সেইটা যেন ও মনে রাখে।

আগেই বলেছি যে মোটামুটি দিনের হিসাব আমি একটা রেখে-ছিলাম। সে-অনুসারে সেদিনটা ছিল শুক্রবার। ছেলেটার নিজের সমাজে পিতৃদত্ত নাম একটা অবশ্যই আছে, কিন্তু তা জেনে আমার দরকার নেই। আমি ওকে নিজের দেওয়া ফ্রাইডে-নামেই ডাকব।

ওকে হাতছাড়া হতে দেওয়ার আমার মতলব নেই। ওকে দাস করে রাখব। আমার অবিরাম খাটুনির তাতে কিছু লাঘব হবে নিশ্চয়ই, উপরন্তু একটু একটু ইংরেজী শিখিয়ে নিতে পারলে কথায় বার্তায় আমার নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণা কমিয়েও আনতে পারব খানিকটা।

এইবার আমি তাকে বললাম মাটিতে দুটো গর্ত করতে। বেলে মাটি ওখানে, আমার তরোয়াল দিয়েই তা খোঁড়া যেতে পারে। তরোয়াল দিয়ে নিজে একটু খুঁড়লাম আগে, তারপর তাকে দিলাম হাতিয়ারখানা, আর ইশারায় হুকুম করলাম গর্তটাকে বড় আর গভীর করতে, যাতে মৃতদেহ দুটো তার ভিতরে পুঁতে ফেলা যায়। আমার ভয় আছে, পাছে উপকূল থেকে নরখাদকেরা দল বেঁধে এসে হাজির হয় হারানো সঙ্গী দুটোকে খুঁজতে। আসে যদি, আর মৃতদেহ দুটো দেখতে পায় যদি, তা হলে হত্যাকারীর সন্ধানে তারা এই বনভূমি চষে ফেলবে একেবারে। আর তা যদি তারা করে, তা হলে আমার ঘরবাড়ি তারা ত খুঁজেও পেতে পারে। সুতরাং দেহ-দুটো লুকিয়ে ফেলা চাই এক্ষুণি।

ফ্রাইডে যখন বুঝল যে আমি কী চাই, তখন সে যেন ক্ষুণ্ণ হল খুব। ক্ষুণ্ণ হবে না? এত বিপুল-পরিমাণ সুস্বাদু নরমাংস উদরে না প্রেরণ করে মাটিতে পুঁতে ফেলা কি বুদ্ধিমানের কাজ? ফ্রাইডে ইশারা ইঙ্গিতে তার মনের কথাটা আমার স্পষ্ট ভাবেই বুঝিয়ে দিল। একবার দেহগুলোর দিকে দেখায়, আর একবার নিজের পেটের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ নেড়ে দাঁতে দাঁত ঘষে শূল্যপক্ক মাংস চর্বণের আনন্দ যে কী গভীর, তাই আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

ওর মনের কথাটা বুঝবার পরে স্বভাবতঃই আমাকে তেলে-বেগুনে জ্বলে-ওঠার ভান করতে হল। ওকে যদি নিজের কাছে রাখতেই হয়, তা হলে নরমাংস ভোজনের স্পৃহা ওর মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি ভীষণ তর্জনগর্জন

শুরু করলাম তাকে লক্ষ্য করে, বন্দুক উঁচিয়ে তাকও করলাম তার দিকে। আর তাই দেখে সে ছুটে এসে একেবারে আমার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, আমার নতুন জুতোর উপরে চুমো খেতে লাগল বারবার। অর্থাৎ সে যে সর্ববিষয়েই আমার আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত, তা সবরকম সম্ভাব্য উপায়ে আমাকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

এর পর দেহ দুটোকে কবর দিয়ে আমরা বনের আড়ালে আড়ালে উপকূলে ফিরে গেলাম। গিয়ে দেখি—নরখাদকেরা নৌকোয় চড়ে এ দ্বীপ ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। পলাতক বন্দীর বা পরিত্যক্ত সঙ্গী-যুগলের সন্ধানে যাওয়ার গরজও তারা বোঝে নি। যাওয়া বোধ হয় সম্ভবও ছিল না। কারণ তারা এসেছিল জোয়ারে নৌকা ভাসিয়ে। সে জোয়ার শেষ হয়ে এখন ভাটিরও অর্ধেক পার হয়ে এল। বাকী ভাটির মধ্যে নিজেদের জায়গায় ফিরে যেতে না পারলে তাদের আজ আর ফেরা হবে না। জোয়ার ফিরে এলে আর ত বাহিরমুখী নৌকা চালানোই যাবে না সমুদ্রে!

যাক, ওরা গিয়েছে। আপাততঃ নিশ্চিন্দি। আমি দেখলাম —নরখাদকদের ভোজের পরিত্যক্ত মাংসের টুকরোগুলোর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাচ্ছে ফ্রাইডে। আমি আবার ভীষণ রেগে উঠলাম তার উপরে, নিজে ওয়াক-ওয়াক করলাম কয়েকবার, যেন ও চিন্তাতেই বমি এসে যাচ্ছে আমার, ফ্রাইডে খানিকটা ভয়ে, খানিকটা লজ্জায় মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল অনুতপ্তের মত।

এইবার ওকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমি ওকে একটা প্যান্ট, আর একটা শার্ট দিলাম পরতে। এগুলি সম্প্রতি স্পেনিশ জাহাজের ভগ্নাবশেষ থেকে এনেছিলাম আমি, নিজের চামড়ার পোশাকেই বেশ কাজ দিচ্ছে বলে নিজে ব্যবহারের তাগিদ বুঝি নি।

ভেবেছিলাম, ফ্রাইডে হয়ত পোশাক পরতে আপত্তি করবে। ও রেওয়াজ ত ওদের দেশেই নেই কিনা! কিন্তু আমাকে আশ্চর্য

করে দিয়ে ও যেন বেশী খুশী হয়েই পোশাকটা গায়ে চড়িয়ে নিল। অবশ্য চড়ানোর ব্যাপারটায় আমার সাহায্য তার দরকার হয়েছিল প্রথম দিন।

এইবার ফ্রাইডের শিক্ষা আরম্ভ হল। টুকিটাকি জিনিসের ইংরেজী নাম ও ছ'দিনেই আয়ত্ত করে নিল। একমাসের মধ্যে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে ও কথা কইতে শুরু করল আমার সঙ্গে। ছেলেটিকে যতই দেখি, ততই ভাল লাগে আমার। যেমন হাসিখুশী, তেমনি পরিশ্রমী। আর আমার উপরে ওর একটা অকৃত্রিম অনুরাগও জন্মেছে, শত্রুকবল থেকে ওকে রক্ষা করেছিলাম বলে।

আমার চাষবাসের ব্যাপারে ও সাহায্য করতে লাগল খুব আগ্রহের সঙ্গেই। এত দিন আমি একা ছিলাম, বেশী জমিতে গম বা ধান উৎপাদনের দরকার হত না আমার। কিন্তু এখন ত আমরা ছ'জন হয়েছি। এবার শস্য পাওয়া দরকার আগেরও ডবল। অনেকখানি বেশী জমি ঘিরে নিয়ে, কুপিয়ে, চাষের যোগ্য করল ফ্রাইডেই, যদিও নিজের দ্বীপে থাকতে চাষবাসের ধার ও ধারে নি কোনদিন।

ক্রমে ও ইংরেজীতে বেশ কথা বলতে শিখল। তখন শুনতে পেলাম ওদের দেশের বৃত্তান্ত। ওরা বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত। প্রত্যেক উপজাতির সুনির্দিষ্ট এলাকা আছে এক একটা, অন্তর্দ্বন্দ্ব যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই আছে। সাম্প্রতিক এইরকমই একটা যুদ্ধে ফ্রাইডেদের দলটা হেরে যায়, এবং ফ্রাইডে হয় বন্দী। বন্দীদের খেয়ে ফেলাই ওদের দেশের প্রথা। কিন্তু কোন বিদেশী যদি বিপন্ন হয়ে ওদের দেশে এসে পড়ে ও আশ্রয় ভিক্ষা করে, তাকে ওরা প্রাণান্তে খাবে না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ও বলল যে কয়েক মাস আগে এই দিককারই সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে সতেরোজন সাদা মানুষ নাকি ফ্রাইডেদেরই প্রতিবেশী এক উপজাতির দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের

ওরা খেয়ে ফেলে নি, বরং তারা যাতে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে, তার জন্য সাহায্যই করেছে যথাসম্ভব।

আমার তখুনি মনে হল—এই সতেরোটা লোক নিশ্চয়ই ভাগ্যহীন হিসপ্যানিওলা জাহাজের নাবিক, যে হিসপ্যানিওলাতে আমি সম্প্রতি গিয়েছিলাম, এবং একটাও জীবিত মানুষ দেখতে পাই নি। আমার পায়ের এই জুতো জোড়ার মালিক তাহলে হয়ত ফ্রাইডেদের প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নিয়ে রয়েছে।

"তারা আছে কেমন ?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"না, তারা ভাল নেই"—বলল ফ্রাইডে—"আদিবাসীরা অবশ্য তাদের খেয়ে ফেলে নি, বা ক্রীতদাসে পরিণত করে নি। কিন্তু নিজেরাই তারা খেতে পায় না, সতেরোটা বিদেশীকে তারা খাওয়াবে কেমন করে ? চাষবাসের ব্যবস্থা আমাদের দেশে কোথাও নেই, বিদেশীরাও করে উঠতে পারে নি সে-ব্যবস্থা। আপনার মত করিৎকর্মা তারা নয় ত ! খুব কষ্ট তাদের খাওয়া-দাওয়ার।"

আমি ভাবলাম—হতভাগারা যদি এখানে এসে পড়ত সেই ঝড়ের রাতে, খাওয়ার কষ্ট তারা পেত না। ভগবানের দয়ায় ক্রুসোর দ্বীপ অফলা নয়।

নয়

ঠিক ছয় মাস পরে।

ফ্রাইডে ছুটতে ছুটতে এসে বলল এক সকালে—নরখাদকদের নৌকা এসেছে আবার। নৌকা দু খানা, লোক তাতে এক, দুই, তিন, এক, দুই, তিন, এক, দুই, তিন, এক, দুই, তিন। ফ্রাইডে তিনের বেশী গুনতে শেখে নি এখনও। তিন পর্যন্ত চারবার গুনে সে আমাকে বোঝাতে চাইছে চারবার তিন হলে যা হয়, অর্থাৎ বারোটা মানুষ এসেছে দু'খানা নৌকায়। এবং বন্দী আছে তাদের সঙ্গে দুই জন, তাদের মধ্যে একজন হল সাদা মানুষ।

সাদা মানুষ? আমি ফ্রাইডেকে বারবার জিজ্ঞাসা করলাম— "তুই ঠিক দেখেছিস? সাদা?"

ফ্রাইডে বলে সে ঠিকই দেখেছে। খুব কাছেই সে লুকিয়ে ছিল, দেখতে ভুল হয় নি।

অনেক কথাই ফ্রাইডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম। সাদা যদি হয়, নিঃসন্দেহে সে হিসপ্যানিওলা জাহাজের দুর্ভাগ্য সতেরো জন নাবিকের মধ্যে একজন। তাদের ত কালোরা আশ্রয় দিয়েছিল না? তবে আবার তাদেরই একজনকে ধরে এনে খেয়ে ফেলার তোড়জোড় করছে কেন? ফ্রাইডে না বলেছিল যে যুদ্ধবন্দী ছাড়া অন্য কাউকে এ অঞ্চলের কালো মানুষেরা খায় না? তবে কি বুঝতে হবে যে আশ্রয়দাতাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে গিয়েছিল স্পেনিশ নাবিকেরা?

জিজ্ঞাসা করবার অনেক কথাই ছিল, কিন্তু সময় ছিল না জিজ্ঞাসা করার। দেরি করলে ততক্ষণে হয়ত বন্দীদের বলি দিয়ে ফেলবে নরখাদকেরা। বন্দীদের একজন যখন স্পেনিয়ার্ড, তখন তার প্রাণরক্ষার চেষ্টা ত আমাকে করতেই হবে। সেবারে কৃষ্ণাঙ্গ

ফ্রাইডেকে রক্ষা করেছি। এবারে আমার স্বধর্মী একজন সাদা মানুষকে রক্ষা করার জন্য আমার ত দ্বিগুণ আগ্রহই থাকার কথা।

আমি ছুটলাম। এবারে একা নই। ফ্রাইডেও সঙ্গে আছে। তার হাতেও বন্দুক, তাকে এই ছয় মাসে বন্দুক চালাতে শিখিয়েছি। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ফ্রাইডেই। সে পুরোনো জায়গা কিন্তু নয়। সেটা ছিল দ্বীপের উত্তর-পুব কোণে, এবারে নৌকো লেগেছে দক্ষিণ দিকে। ফ্রাইডে বলল—এরা অন্য গোষ্ঠীর লোক, সম্ভবতঃ এখানে ওদের এই প্রথম আগমন।

আমরা যখন পৌঁছোলাম, তখন আগুন জ্বলে উঠেছে, স্পেনিয়াড লোকটিকেই আগে টেনে নামিয়েছে নৌকো থেকে। আর আধ মিনিট দেরি হলেই লোকটাকে আর বাঁচানো যেত না। একটা হিংস্র চেহারার প্রকাণ্ড মানুষ কাঠের একখানা তরোয়াল তুলেছে ওর মাথা লক্ষ্য করে। ফ্রাইডেকে যারা বেঁধে এনেছিল, তাদের কারও হাতে এ-অস্ত্র দেখি নি। পরে এ-তরোয়াল একখানা বেলাভূমিতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। যেমন ভারী, তেমনি ধারালো। কাঠের মুখে এমন ধার তুলতে পারা খুবই ওস্তাদি বলতে হবে। এর এক কোপে মানুষের গলা কেটে দুখানা হয়ে যেতে পারে অনায়াসে।

হ্যাঁ, হিংস্র একটা পাষণ্ড ঐ তরোয়ালের কোপ বসাতে যাচ্ছে ইউবার্টোর গলায়, (পরে জেনেছিলাম ওর নাম ইউবার্টো) আমি গুলি চালালাম আড়াল থেকে। ফ্রাইডেও চালাল তার বন্দুক। দু'জন মাটিতে পড়ে গিয়ে ধড়ফড় করছে, তাই দেখে দলের বাকী দশ জন এ ওর গায়ে পড়ে ভয়ে বিস্ময়ে। আবার একবার গুলি জোড়া বন্দুক থেকে—পড়ল আরও দুজন। বাকী আট জন আর দাঁড়াল না। সোজা সমুদ্রের দিকে দৌড়োলো।

ওদের বরাত মন্দ, ভাটি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে, নৌকোর তলা থেকে জল নেমে গিয়েছে অন্ততঃ বিশ ফুট দূরে। সে বিশ ফুট আবার পাথরের চাঙ্গড়ে ভরা। মরিয়া হয়ে সেই

পাথরের উপর দিয়েই নৌকা ঠেলে নামাতে গেল ওরা। ফলে একখানা নৌকার তলা গেল ফুটো হয়ে। তাই দেখে একটা হতাশার চিৎকার বেরিয়ে এল ওদের কণ্ঠ থেকে, আর দ্বিতীয় নৌকোটা নামাবার চেষ্টা ত্যাগ করে লোকগুলো দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। আমরা মাঝে মাঝে গুলি চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ওদের লক্ষ্য করে নয়। আর নরহত্যা করতে আমরা চাই না, চাই যে ভয় পেয়ে বাকী লোকগুলো সমুদ্রে গিয়ে পড়ুক, পারে ত সাঁতার দিয়ে দেশে ফিরে যাক। আমার উদ্দেশ্য ওদের নৌকো দু'খানা দখল করা।

ওরা যখন দূর সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে, আমি এগিয়ে গেলাম ইউবার্টোর কাছে। আমি স্পেনিশ জানি সামান্য, ইউবার্টোও ইংরেজী জানে সামান্য। যা হোক করে আলাপ চলল আমাদের। শুনলাম—সত্যিই ও হিসপ্যানিওলা জাহাজের সপ্তদশ নাবিকের একজন। ওদের নৌকা ভাসতে ভাসতে গিয়ে ক্যারিব সাগরের একটা দ্বীপে লাগে। সেখানকার কালো মানুষেরা নরখাদক হলেও শরণার্থীর উপরে অত্যাচার করে না। কিন্তু আশ্রয় ছাড়া আর কিছুই দেবার মত অবস্থা তাদের নয়। কাজেই স্পেনিয়ার্ডরা বাধ্য হয়েছিল এ-বন সে-বন থেকে ছাগল মারতে। ক্রমে নিকটবর্তী সব বনের ছাগবংশ হয়ে গেল নির্মূল, ওরা যেতে শুরু করল দূরে দূরে। এইভাবে একদা আশ্রয়দাতাদের এলাকার বাইরে গিয়ে পড়ল ওরা, আর আক্রান্ত হল অচেনা এক উপজাতির দ্বারা। ওদের বন্দুক ছিল, কাজেই গুলি চালাতে চালাতে অন্য ষোলজন পালাতে পেরেছিল। ইউবার্টোও পারত, কিন্তু লাফিয়ে একটা নালা পেরুবার সময় ওর বন্দুকটা জলে পড়ে যায়, আর তক্ষুণি শত্রুরা ধরে ফেলে ওকে। ওদের প্রথা হল এই যে নরমাংসের ভোজ দিতে হলে নিজেদের দ্বীপে ওরা তা কখনো দেয় না। ওদের কুসংস্কারে তা বাধে। তাই নৌকো নিয়ে এই দ্বীপে চলে এসেছে ওরা।

আমি ইউবার্টোর সঙ্গে কথা কইতে কইতে তন্ময় হয়ে গেছি,

এমন সময় ফ্রাইডের হাউমাউ চিৎকারে চমকে উঠে আমি সেদিকে দৌড়োলাম। ভেবেছিলাম—তার কোন বিপদই বুঝি হয়েছে। কিন্তু গিয়ে দেখি তা নয়। নৌকোর খোলে দ্বিতীয় এক বন্দী পড়ে আছে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায়। তাকেই ধরে ধরে নাড়া দিচ্ছে ফ্রাইডে, আর হাউমাউ করছে ক্রমাগত। কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে, কখনও লাফাচ্ছে।

কী? কী? কী?

"আমার বাবা! আমার বাবা!"

তাড়াতাড়ি ওর বাবার বাঁধন খুলে দিয়ে ওর মুখে খানিকটা জল দিলাম। আর্তত্রাণে বেরুবার আগে এক বোতল জল আমি ঝোলার ভিতর নিয়েছিলাম, তার অর্ধেকটা ইউবার্টোকেও দিয়েছি।

ফ্রাইডের বাবাকে বুড়োই বলতে হবে অবশ্য, তবু বেশ শক্ত-সমর্থই আছে সে। শুনলাম ও বন্দী হয়েছে বেশ কিছু দিন আগে, স্বতন্ত্র এক লড়াইয়ে। একটা মাত্র বুড়োর মাংস দিয়ে ভোজ হয় না, তাই ওকে আটক করে জিইয়ে রেখেছিল এতদিন শত্রুরা। এইবার ইউবার্টো বন্দী হল যখন, দুটো বন্দীকে একত্র করে ভোজটা সেরে ফেলবার চেষ্টায় ছিল ওরা। তা তার পরিণাম ত এই হল।

দুই বন্দীকে মুক্ত করে আমি বাড়ি নিয়ে এলাম। গুহা গৃহে নয়, গভীর বনে আমার যে তৃতীয় গৃহ আছে, সেইখানে। এ উপকূল থেকে সেটাই নিকট। নৌকা দু'খানা কূলের উপর টেনে নিয়ে এলাম, ভাঙ্গা নৌকাখানা মেরামত করে নেব ক্রমশঃ।

একটা মতলব মাথায় এসেছে আমার। এই দু'খানা নৌকাতে চড়িয়ে ইউবার্টো আর ফ্রাইডের বাবাকে আমি পাঠিয়ে দেব, স্পেনিয়ার্ড ষোল জনকে এই দ্বীপে নিয়ে আসবার জন্য। তারা ওখানে খেতে পাচ্ছে না। এখানে এসে চাষ-বাস করুক। আমি জমি দেব, লাঙ্গল দেব, দেব বীজশস্যও। দ্বীপটাও আমার জনবহুল হয়ে উঠবে তাহলে।

মতলবটা ওদের কাছে খুলে বলতেই ওরা সানন্দে সায় দিল সবাই। কিন্তু আমার ফ্রাইডে একটা কথা যা তুলল, তা ভাববার মত। সে বলল—"ওদের যে আনবেন, ওদের খেতে দেবেন কী? ধান, গম, যব—যা কিছু বলুন, দুই জন বা তিন জনের মতই আছে এখানে। কুড়ি জন সমানে খেতে থাকলে দুই দিনেই যে শেষ হয়ে যাবে!"

খুব ভাববার কথা। আমরা অবশেষে সিদ্ধান্ত করলাম—তিন চার মাস আরও অপেক্ষা করতেই হবে। এর মধ্যে আর একটা ফসল তুলে নেওয়া যাক, অনেক বেশী বেশী জমি চাষ করে। যাতে কুড়িজন লোকেরও অন্ততঃ ছয় মাসের খোরাকি হয়।

সেই অনুসারেই চলল কাজ। বড় বড় মাঠ আমরা চষে ফেললাম। খাটবার লোক চারজন এখন, কোন মেহনতেই আমরা আর পিছ-পা হই না। অবশেষে সে-ফসল উঠল একদিন। ফ্রাইডের বাবাকে নিয়ে ইউবার্টো রওনা হয়ে গেল দু'খানা নৌকোতে। আমি ফ্রাইডের আচরণে মুগ্ধ হয়ে গেলাম এই উপলক্ষে। তাকে বলেছিলাম—"ইচ্ছা হয় ত বাবার সঙ্গে তুমিও নিজের দেশটা ঘুরে আসতে পার আবার।" তাতে সে বলেছিল—"দেশ বলুন, বাবা বলুন, আমার নিজের জীবন বলুন, সবার উপরে আপনি। আমার প্রাণ দিয়েছেন আপনি, বাবা বেঁচে আছেন আপনারই কল্যাণে, বাবা যে দেশে যেতে পারছে দুদিনের জন্য, সেও আপনারই দয়ায়। আমি আপনাকে ফেলে যাব না কোথাও।"

ইউবার্টো রওনা হয়ে গেল। তখন কি ভবিষ্যদ্বাণী করার মত দৈবশক্তি ভর করেছিল আমার মধ্যে? তাকে যাবার সময় একটা কথা বলে দিলাম। তা এই—"বিজন দ্বীপে বাস; কখন কী হয়, বলা যায় না। এমনও হতে পারে যে ফিরে এসে তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবে না। যদি তাই হয় আমার প্রজারূপে এ-দ্বীপের সব জমি তোমরা ভাগ করে নিও।

চাষ-বাস করে সুখে থেকো। পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি করো না।"

এই মর্মে একটা লেখাপড়া করে দেওয়ারই ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু কালি নেই, লেখা আর হল না। কিন্তু ইউবার্টো ঈশ্বর সাক্ষী করে স্বীকার করল—"আমার কথামতই সে চলবে এবং এ-দ্বীপের উপরে আমার একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্বীকার করে নিতে তার সাথীরা যদি রাজী না হয়, তাহলে তাদের নিয়েই আসবে না এখানে।"

তারপর নৌকা দু'খানা সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে চোখের আড়ালে চলে গেল।

দিনের পর দিন গুনছি, কবে আসে ইউবার্টোরা।

এমন সময়ে একদিন জাহাজ দেখা গেল একখানা। না, চোরা পাহাড়ে এ-জাহাজ আটকা পড়ে নি। বহাল-তবিয়তে চলে আসছিল সকালবেলার সূর্যালোকে, এমন সময় পাল নামিয়ে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সমুদ্রে। আমার দ্বীপ থেকে তার দূরত্ব তখন দুই মাইলেরও কম! আমি চরম উত্তেজনায় কাঁপছি তখন। এ জাহাজ যদি কোন সৎলোকের হয়, তবে হয়ত আমার মুক্তির উপায় হল। আজ দীর্ঘ আটাশ বছর পরে মুক্তির উপায় হয়ত হল আমার।

পাহাড়ের মাথা থেকেই দেখতে পেয়েছি জাহাজ। ফ্রাইডেকে ডেকে বললাম—"শীগ্‌গির একটা আগুন জ্বালো এখানে, কাঁচা ডাল-পালা চাপাও তাতে, যাতে ধোঁয়া হয় খুব।" পরক্ষণেই আবার ফ্রাইডেকে নিষেধ করলাম আগুন জ্বালতে। সতর্ক হওয়া দরকার। ও জাহাজ বোম্বেটের নয় ত? বোম্বেটের হাতে একবার ত আমি পড়েছিলাম পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে! সে-অভিজ্ঞতা ভুলবার নয়। কে জানে যে আর এক বোম্বেটে এখানেও তাড়া করে আসে নি আমাকে?

আমি আগুন জ্বালাতে নিষেধ করেছি ফ্রাইডেকে। দূরবীন চোখে

দিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি জাহাজের দিকে। কোন পতাকা নেই, এ কেমন কথা ? পতাকাহীন জাহাজ ত বোম্বেটেরাই চালায় ! লোকজন চলাফেরা করছে। নৌকা নামাচ্ছে একখানা। জনা দশ বারো লোক নামছে জাহাজ থেকে। এ কেমন ব্যাপার ? একজন লোককে যেন জোর করে নামানো হচ্ছে ? রীতিমত চেষ্টা করছে লোকটা বাধা দেবার জন্য। তাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সিঁড়ির দিকে—

এ কেমন ব্যাপার ? জাহাজ না হয়ে নৌকা হলে ভাবতাম—ওরা নরখাদক, অনিচ্ছুক লোকটা ওদের বন্দী। কিন্তু জাহাজ মানেই সভ্য জাতির জাহাজ, সভ্য জাতি কখনো—

কিন্তু নৌকা খুলে দিয়েছে। নৌকা এগিয়ে আসছে আমারই কূলের দিকে। দশ বারোটা নাবিক আর সেই বন্দী। সেবারেও বারোটা অসভ্য এসেছিল এক বন্দী নিয়ে। কিন্তু একরকম পরিস্থিতি নয়। তাদের বন্দুক ছিল না, এদের আছে। গুলির জবাবে পাল্টা গুলি এরাও চালাতে পারবে। তবে আমার পক্ষে যে সুবিধা একেবারেই নেই, তা নয়। ওরা আসছে, সেটা আমরা জানি। কিন্তু আমরা যে ওত পেতে আছি এখানে, তা ওরা জানে না। আচমকা আক্রমণের সুযোগ আমাদের আছে, ওদের নেই। উলটে বরং অদৃশ্য শত্রুর বিপক্ষে আত্মরক্ষার দায়িত্ব পড়বে ওদের ঘাড়ে।

এসে পড়ল ওরা। আমরাও আর পাহাড়ে দাঁড়িয়ে নেই। যদি কিছু করতে হয়, উপকূল পর্যন্ত গিয়ে তবে তা করতে হবে আমাদের। ওরা কিছু আর বন্দীকে নিয়ে আমার বাড়িতে আসছে না। এমন কি, উপকূল ছেড়ে জঙ্গলেও ওরা ঢুকবে না হয়ত।

না, পাহাড়ে আর দাঁড়িয়ে নেই আমরা। ছুটে চলে এসেছি জঙ্গল ভেঙে। নৌকার গতি দেখেই অনুমান করেছিলাম যে উপ-কূলের কোন্ অংশে এসে ভিড়বে ওরা। সেই অনুযায়ী স্থান গ্রহণ

করেছি আমরা। ক্রমে ওরা এসে নামল। আমরা যেখানে লুকিয়ে আছি ঝোপের ভিতর, তার অদূরেই।

ওরা নেমেছে, বন্দীকে টেনে নামিয়েছে। সুপুরুষ প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক, চেহারা দেখে ইংরেজ বলে অনুমান হয় এবং পোশাক দেখে বোঝা যায় যে উচু পর্যায়ের নৌ-কর্মচারী। পদমর্যাদাব প্রতীক আঁকা থাকে অবশ্য টুপিতে, সেই টুপিই নেই এঁর মাথায়, বন্দী যখন, পদচ্যুতি অবশ্যই ঘটে থাকতে পারে। টুপির অন্তর্ধান হয়ত সেই অপসারণেরই ফল।

এই লোকটিকে নাবিকেরা অকারণে টানা হ্যাঁচড়া করছে, অহেতুক অপমানে পদে পদে নির্যাতিত করছে। খুবই ব্যথিত হলাম আমি তা দেখে। মনে মনে একটা ধারণা করে নিয়েছি এই ব্যাপারটা সম্পর্কে, দেখি সে ধারণা ঠিক কিনা। বন্দীই হয়ত ছিলেন ঐ জাহাজের কাপ্তেন, নাবিকেরা হয়ত বিদ্রোহ করেছে তাঁর বিরুদ্ধে। হয়ত এই দ্বীপে নিয়ে এসেছে—

নাঃ, হত্যা করবার জন্য নয় বোধ হয়। সে প্রয়োজন থাকলে ত জাহাজে বসেই তা করে ফেলতে পারত। মেরে বস্তাবন্দী করে ফেলে দিতে পারত সমুদ্রে। কষ্ট করে এই জংলা উপকূলে এসে উঠবে কেন ?

তবে ? ওরা কি ভদ্রলোককে এইখানে একা ফেলে চলে যেতে চায় ? সে-দণ্ড ত মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও ভয়াবহ !

অবস্থাটা অচিরেই বুঝতে পারব, আশা হচ্ছে। ওরা দুইজন একজন করে বনের ভিতর ঢুকে পড়ছে। আমার বনের গাছে গাছে ফল। বিশেষ আঙ্গুরের মরসুম এটা। বুনো দ্রাক্ষালতায় মহীরুহেরা আচ্ছন্ন একেবারে, আর সে-সব লতা যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে ফলের ভারে। ইওরোপের মানুষ ত আঙ্গুরের নামে পাগল !

এ-গাছে ও-গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়েছে ওরা। বন্দী

একা বসে আছেন এক গাছতলায়। গাছের সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখে গিয়েছে তাঁকে। আষ্টেপৃষ্ঠে শক্ত দড়ির বাঁধন, নিজের চেষ্টায় পালানো একেবারেই অসম্ভব ভদ্রলোকের পক্ষে।

ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে আমি আর ফ্রাইডে গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর পাশে। গাছটার গুঁড়ি যথেষ্ট মোটা, পুরোপুরিই আড়াল করে রেখেছে আমাদের। ভদ্রলোক মাথা হেঁট করে ছিলেন, আমাদের উপস্থিতি টেরই পান নি। আমি মৃদুস্বরে ইংরেজীতে বললাম—"সুপ্রভাত!"

ভদ্রলোক যে কীভাবে চমকে উঠলেন, তা বলে বোঝানো যাবে না। আমি বললাম—"এই দ্বীপ আমার। আপনার উপরে অত্যাচার হয়েছে, বুঝতে পারছি। অন্যায় যদি আপনার দিক থেকে না হয়ে থাকে, তবে সে অত্যাচারের প্রতীকার আমি করব। সংক্ষেপে বলুন আপনার কাহিনীটা।"

ভদ্রলোক সংক্ষেপেই বললেন। অদূর সমুদ্রের ঐ জাহাজের নাম "গ্যালাহাড"। লিভারপুলের জাহাজ। ভদ্রলোকের নাম হার্ডিং, তিনিই ছিলেন কাপ্তেন। ত্রিনিদাদ যাচ্ছিল জাহাজ বোস্টন থেকে, মালবোঝাই হয়ে। বোস্টনে এবার তিনি নতুন লোক নিয়োগ করেন জনা দশেক, তাদের মধ্যে একজনকে করেছিলেন প্রথম মেট। এ লোকটা যে আধা-বোম্বেটে স্বভাবের দুর্বৃত্ত, তা তিনি আগে জানতে পারেন নি।

জাহাজ বোস্টন থেকে যাত্রা শুরু করার পর থেকেই এই মেট, ফিলিপস্ তার নাম, নবনিযুক্ত নাবিকদের ফুসলাতে শুরু করে। পরামর্শ দেয় বিদ্রোহ করবার। আশা দেয় যে ত্রিনিদাদ না গিয়ে জাহাজ সে দক্ষিণ আমেরিকার কোন সুদূর বন্দরে নিয়ে যাবে, সমস্ত মাল সেখানে নগদ দামে বিক্রি করে সমস্ত অর্থটাই নাবিকদের ভিতরে বেঁটে দেবে। নতুন নাবিকেরা রাজী হয়ে যায় একে একে, কাল রাত্রে হঠাৎ তারা অস্ত্রাগার দখল করে বসে। জাহাজের দশটা

বন্দুক সবই হাত করে নেয়, টোটাবারুদ সব সমেত। তারপর বন্দুক দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হুকুম করে কাপ্তেনকে ও তাঁর বিশ্বস্ত পুরাতন নাবিক পনেরো জনকে। একটা ধস্তাধস্তি হয়, বন্দুক সব বিদ্রোহীদের দখলে বলে কাপ্তেনের দলের জনা পাঁচেক হয় হতাহত। অকারণ নরহত্যা বন্ধ করার জন্য কাপ্তেন বশ্যতা স্বীকার করেন এই শর্তে যে তাঁকে যে দণ্ডই দিতে চায় বিদ্রোহীরা, তা দিতে পারবে, কিন্তু তাঁর অনুগামীদের আর কেশাগ্র স্পর্শ করবে না তারা। উক্ত অনুগামীরা অবশ্য অতঃপর ফিলিপস্‌কেই কাপ্তেন বলে স্বীকার করে নিতে রাজী হয়, হার্ডিংয়েরই অনুরোধে।

গল্প শেষ হওয়ার আগেই আমার ইঙ্গিতে ফ্রাইডে কাপ্তেন হার্ডিংয়ের বন্ধন কেটে দিয়েছে। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে একটা বন্দুক তাঁর হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"জাহাজের দশটা বন্দুক কোথায় এখন?" কাপ্তেন বললেন—"ঐ নৌকাতেই ফিলিপস্-এর অনুগামী এসেছে পাঁচজন, পাঁচটা বন্দুক হাতে আছে তাদেরই। বাকী পাঁচটা আছে জাহাজেই।"

বন্দুক পিঠে নিয়েই ওরা গাছে উঠেছে? থাকুক, ওরা পেট ভরে আঙ্গুর খেতে থাকুক! আমরা তিনজনে চুপিসাড়ে নৌকাতে উঠে বসলাম গিয়ে। নৌকা ছেড়ে দিলাম, উপকূলের একটা মোড় ঘুরে তা ঢুকল গিয়ে সেই খালে, যেখানে আমার নৌকা চিরদিন বাঁধা থাকে।

একটু পরেই দূরশ্রুত কোলাহল কানে আসতে লাগল। বন্দুকের আওয়াজও। অর্থাৎ নৌকার এবং বন্দীর অন্তর্ধানের কথা টের পেয়েছে আঙ্গুরভোজীরা। এবং বন্দুকের আওয়াজ করে কাপ্তেন ফিলিপস্‌কে জানাতে চাইছে দুর্ঘটনার কথা। কী করে ফিলিপস্ এবার, দেখা যাক। হার্ডিং বলছেন, জাহাজে আর একটা ছোট ডিঙ্গি আছে, তাতে জনা চার পাঁচ লোক ধরে বড়জোর। ফিলিপস্ কি সে ডিঙ্গি কূলে পাঠাবে, ব্যাপার কী দেখবার জন্য?

সত্যই পাঠাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক বাদেই ছোট ডিঙ্গি দেখা গেল একটা, দূরবীন লাগিয়ে ঠিক এক গণ্ডা মাথাই দেখতে পেলাম তাতে। হার্ডিংয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তৈরী হয়েছিলাম আমি। একটা বাঁকের কথা বলেছি আগেই, তারই আড়ালে আড়ালে আমরা নৌকা বেয়ে বেরিয়ে গেলাম সমুদ্রে। এতে করে ডিঙ্গির লোকেরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে, ডাঙ্গায় যারা আছে, তারা পাচ্ছে না। ডিঙ্গির লোকেরা ভাবছে নৌকারোহীরা তাদেরই দলের লোক। খবর জানবার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। এইবার আমাদের কাজ শুরু হোক।

শঠে শাঠ্যং। নির্মমের উপরে নির্মম হওয়াই বিধি। বন্দুকের পাল্লার ভিতর আসা মাত্র আমরা একসঙ্গে তিনটে বন্দুক থেকে গুলি ছুড়লাম, ডিঙ্গি তাক করে। ডিঙ্গিতেও দুটো বন্দুকের নল ঝকমক করতে দেখেছি আমরা। কিন্তু ওরা তা ব্যবহার করার সুযোগ পেলো না, ডিঙ্গি তিন জায়গায় ফুটো হয়ে ভুচ করে ডুবে গেল। লোক চারটি হাবুডুবু খাচ্ছে, আর আমরা তাদের মাথা লক্ষ্য করে গুলি করছি। ক্ষণপরেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল জলের তলায়।

ডাঙ্গায় আছে বারোটা নাবিক, এই একতরফা লড়াই তারা দাঁড়িয়ে দেখল একান্তই অসহায়ের মত। বিস্ময়েরও তাদের অন্ত নেই, ভয়েরও না। তাদেরই নৌকায় তিনটে মাথা দেখছে তারা, কাপ্তেনকে তারা চিনতে পেরেছে, কিন্তু অন্য দুটোকে নয়। বন্দুক তাদেরও আছে, পাঁচ পাঁচটা, গুলিও তারা করেছে অনেকগুলো নৌকা লক্ষ্য করে। কিন্তু আমরা তাদের পাল্লার বাইরে।

লোক আমরা মোট তিন জন, আমাদের শত্রু জাহাজে আছে নয় জন, ডাঙ্গায় দশ জন, আর জলের তলায় চার জন। ডাঙ্গায় আর জাহাজে মিলিয়ে যে উনিশ জন হচ্ছে, হার্ডিং ত বলেন যে তার অন্ততঃ অর্ধেক লোক আমাদের পক্ষই নেবে, যদি দু'পক্ষে লড়াই বাধে।

যা হোক, ডাঙ্গার লোকগুলোকে আমরা হিসাব থেকে বাদ দিচ্ছি। ওরা করবে কী? নৌকা নেই ওদের, সাঁতার দিয়ে জাহাজের দিকে এগুবার সাহস ওদের হবে না, কারণ অজানা সমুদ্র, তাতে হাঙ্গর থাকা আশ্চর্য নয়। আর হাঙ্গর না থাকলেও বন্দুক-ধারী শত্রু আমরা আছি। তারা এখন কূলে দাঁড়িয়ে চিল্লানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। নৌকায় একটা টিনের চোঙ আবিষ্কার করে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। দরকার হলে নৌকার নাবিকেরা যাতে ফিলিপস্-এর সঙ্গে দূরের থেকেই কথা কইতে পারে, তারই জন্য এই চোঙ এনেছিল তারা। আমরা এখন এর সদ্ব্যবহার করব। নৌকাটা জাহাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলাম, অবশ্য ওদের গুলির পাল্লার ভিতরে নয়। তারপর হার্ডিং উঠে দাঁড়িয়ে চোঙ মুখে দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন—"গ্যালাহাড জাহাজের পুরাতন নাবিকেরা, তোমাদের কাপ্তেন হার্ডিংয়ের আদেশ শোনো। ফিলিপস্ ছাড়া ওর দলের আর মোটে দু'টো লোক আছে জাহাজে। ওদের তিন জনকে ধরে বেঁধে ফেল এক্ষুণি! আর ফিলিপস্-এর দলের দু'জন শোনো, তোমরা যদি ফিলিপস্‌কে ত্যাগ করে আমার দলে আসতে চাও আবার—আমি তোমাদের ক্ষমা করব।"

এর ফলে যা ঘটল, তা ম্যাজিক। ঐ দু'জন লোক, ওরা দাঁড়িয়ে ছিল ফিলিপস্-এর পাশে। তারা হঠাৎ একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ল ফিলিপস্-এর উপরে আর বন্দুক কেড়ে নিল তার। সঙ্গে সঙ্গে হার্ডিংয়ের দলের সবাই এসে বেঁধে ফেলল ভুঁইফোঁড় কাপ্তেনকে, "থ্রী চীয়ার্স ফর কাপ্তেন হার্ডিং"—রব উঠল বহু কণ্ঠে।

আমরা জাহাজে উঠলাম বিজয়ী বেশে। আমাকে আর ফ্রাইডেকে দেখে অবশ্য ভূতপ্রেত বলেই ওদের সন্দেহ হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু হার্ডিং তাদের আশ্বস্ত করার পরে তারা আমাকে দেবতার মত সম্মান দেখাতে লাগল। কাপ্তেন আমার পরিচয় দিলেন—অদূরবর্তী ক্রুসো দ্বীপের গবর্নর বলে।

তারপর আর কী! ফিলিপস্‌কে ফাঁসি দেওয়া হল তক্ষুণি। সমুদ্রবক্ষে বিদ্রোহীর এ সাজা দেওয়ার অধিকার কাপ্তেনদের থাকে। জাহাজ কূলের কাছে এগিয়ে গেল, বন্দুক কূলে রেখে সেখানকার দশটা লোক এক এক জন করে সাঁতার দিয়ে জাহাজে এসে উঠল। কাপ্তেন নিজের পক্ষপাতী লোকদের গ্রহণ করলেন করমর্দন করে, ফিলিপস্‌-এর দলের সবাইকে করলেন শৃংখলাবদ্ধ। পরে অবশ্য অনেক কান্নাকাটি করে তারা ক্ষমা লাভ করেছিল।

এইবার আমার দেশে ফেরার পালা। আটাশ বৎসর দুই মাস নয় দিন পরে। ফ্রাইডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—সে নিজের দেশে যেতে চায় কি না। সে সাফ জবাব দিল—আমায় সে জীবন থাকতে ত্যাগ করবে না। কাজেই তাকে সঙ্গে নিলাম আমি, আর নিলাম আমার তোতাপাখি পলিকে। ইংলণ্ডে পৌঁছেও যাতে সে রোজ সকালে আমার ঘুম ভাঙ্গাতে পারে "বেচারী ক্রুসো, কোথায় গিয়েছিলে তুমি" বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।

কূলে গিয়ে আমার মোহরের গাদাটা নিয়ে এলাম, যা পেয়েছিলাম "হিসপ্যানিওলা" জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে। কাজে লাগতে পারে এটা। বাবা-মা নিশ্চয় জীবিত নেই। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে দুঃস্থ যদি কাউকে দেখি, দেব তাকে কিছু। আর কিছু অর্থ উপহার দেব হিতৈষিণী বান্ধবী মিসেস রেনল্ডকে আর পরম উপকারী কাপ্তেন আল্‌ফন্‌জোকে। তাঁরা এখনও বোধ হয় জীবিত আছেন, আমার চেয়ে বয়সে বেশী বড় ত তাঁরা ছিলেন না! ব্রেজিলে আমার আবাদটা এখনও আছে কিনা, সে-খবরও আল্‌ফন্‌জোর কাছেই পাব নিশ্চয়। থাকে যদি, সেটা বেচে ফেলার ব্যবস্থা করব ওঁর সাহায্যেই। পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়েই দেশে যাচ্ছি।

যাচ্ছি বটে, কিন্তু দেশে আমার মন টিকবে কী? জন্মভূমি যদিও নয়, এই বিজন দ্বীপের সঙ্গে নাড়ীর বাঁধন যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে

গিয়েছে আমার! আবার ফিরে আসবার সংকল্প নিয়েই আমি ত্যাগ করে যাচ্ছি আমার দ্বীপ। ইউবার্টোর নামে একটা চিঠি লিখে রেখে গেলাম গুহাগৃহের দরজায় সেঁটে, হার্ডিং স্পেনিশ ভাষা জানেন মোটামুটি, তিনিই দিয়েছেন লিখে।

ইউবার্টোকে লিখলাম তার ষোল জন জাত ভাইকে নিয়ে সে আমার দ্বীপে বসবাস করুক শান্তিসুখে। কিন্তু কখনো যেন ভুলে না যায় যে এ-দ্বীপের মালিক রবিন ক্রুসো, এবং রবিন ক্রুসো ফিরে আসবে শীঘ্রই। এসে যদি দেখে যে তার স্বার্থহানি কেউ করেছে এ দ্বীপে, বা কোন নৈতিক অপরাধে অপরাধী হয়েছে তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, তাহলে রবিন ক্রুসো যোগ্য সাজা দেবে তাকে। সাজা দেওয়ার ক্ষমতা যে রাখে রবিন ক্রুসো, তা ত জানে ইউবার্টো!

এইবার তোমার কাছে কিছুদিনের জন্য বিদায় নিই, হে আমার করুণাময়ি কর্মভূমি! আবার তুমি কাছে টেনে আনবে একদিন, এই আশা অন্তরে নিয়ে বিদায় বেলার প্রণাম নিবেদন করি তোমাকে।

শেষ